

Classification
Code : 4.7 4.7
Serial No. 48
Title : Bigyan O Bigyan
351

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

Approved by the Board of Secondary Education, Assam as a text book for rapid reading for Class V
(Vide Noti. No. SEBA/EU/TXB/10/78, dated 9.1.73)

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

(পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য)

8·7

351

অধ্যাপক
শ্রীবরুণকুমার পাইন
এম. এস-সি., ডি. ফিল.

Rs 1 75

প্রাপ্তিস্থান :

ইউ. এন. ধর এ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২
ল-ইয়ার্স বুক-স্টল, গৌহাটী
বুকল্যাণ্ড, গৌহাটী
নিউ বুক-স্টল, গৌহাটী
আলি ব্রাদার্স, শিলচর
গুহ এ্যাণ্ড কোং, হাইলাকান্দি
বীণা লাইব্রেরী, করিমগঞ্জ
স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী, ধুবড়ী
উদয়ন, তিনসুকিয়া

প্রকাশক
বাণী পাইন এম্. এস্-সি.
২ ভবানীদত্ত লেন,
কলিকাতা-৭

Acc. no. - 14975

মুদ্রক :
শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

গল্পসূচী

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

আর্কিমিডিস

খৃষ্টের জন্মের প্রায় আড়াইশো বছর আগেকার কথা। একদিন এক বিজ্ঞানী স্নানের ঘর থেকে ভেজা কাপড়েই হঠাৎ বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। সেই অবস্থাতেই ছুটতে ছুটতে তিনি চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন—"আমি পেয়েছি! আমি পেয়েছি!"

বিজ্ঞানীর নাম আর্কিমিডিস। তিনি কি পেয়েছিলেন, তা বলছি।

আর্কিমিডিসের দেশের রাজা হীরো একটি সোনার মুকুট তৈরি করিয়েছিলেন। মুকুটটির কোনও রকম ক্ষতি না করে সেটি খাঁটি সোনার কিনা তা পরীক্ষা করার ভার ছিল আর্কিমিডিসের ওপর।

আর্কিমিডিস ভাবতে লাগলেন। কিছুতেই তিনি এ প্রশ্নের সমাধান করতে পারছেন না। এমন সময় একদিন কানায় কানায় ভর্তি একটি চৌবাচ্চায় নেমে স্নান করতে গিয়ে আর্কিমিডিস লক্ষ্য করলেন যে খানিকটা জল উপচে পড়ে গেল।

কানায় কানায় জলে ভর্তি পাত্রে কোনও বস্তুকে ডোবালে যে জল উপচে পড়ে, তার সাহায্যে ঐ বস্তুর আয়তন নির্ণয় করা যায়। এই সূত্র-অনুসারে আর্কিমিডিস মুকুটটির আয়তন নির্ণয় করতে

সক্ষম হবেন। কারণ, সেই উপচে-পড়া জলের সমান আয়তনের খাঁটি সোনার ওজন যদি মুকুটটির ওজনের সমান হয়, তাহলে বুঝতে হবে মুকুটের সোনা খাঁটি। আর তা যদি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে, মুকুটের সোনায় ভেজাল আছে। আর্কিমিডিস এই কথা চিন্তা করেই 'পেয়েছি, পেয়েছি' বলে রাস্তায় ছুটে বেরিয়ে এলেন।

রাজার মুকুটটি না গালিয়ে কেবলমাত্র জলে ডুবিয়েই তিনি ধরতে পেরেছিলেন যে, সত্যিই সেটি খাঁটি সোনার ছিল না। যে স্যাকরা মুকুট তৈরি করেছিল, সেও তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল।

তোমরা সবাই জান যে কপিকলের সাহায্যে জলভরা বালতি সহজেই কুয়ো থেকে তুলতে পারা যায়। শুধু জল নয়, কোন ভারী জিনিস কপিকলের সাহায্যে সুবিধামত স্থান থেকে অপেক্ষাকৃত কম শক্তি প্রয়োগ ক'রে তোলা যায়। এই কপিকল হচ্ছে আর্কিমিডিসের আবিষ্কার।

কোন জায়গাকে ভর করে ওঠানামা করতে পারে এরকম একটি বড় ডাণ্ডার একপ্রান্তে ভারী জিনিস রেখে অপর প্রান্তে চাপ দিলে অনায়াসে ভারটি তুলতে পারা যায়। আর্কিমিডিস বলেন, ডাণ্ডার ভারচাপা দিকটার তুলনায় অপর দিকটা যত বেশী লম্বা হবে, তত কম শক্তি প্রয়োগ করে সেই ভারী জিনিসটা তুলতে পারা যাবে। এই যন্ত্রের নাম 'লিভার'। এটিও আর্কিমিডিসের আবিষ্কার।

আর্কিমিডিস বলেছিলেন যে পৃথিবীর বাইরে দাঁড়িয়ে একটি মস্ত বড় ডাণ্ডার সাহায্যে এইভাবে গোটা পৃথিবীটাকেই তুলতে পারা যায়। কিন্তু সেরকম বড় ডাণ্ডাই বা কোথায়? পৃথিবীর বাইরে আর্কিমিডিস দাঁড়াবেনই বা কোন্ জায়গায়?

আর্কিমিডিসের আবিষ্কার-সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত আছে।

একবার রোমানরা সাইরাকিউস রাজ্য আক্রমণ করতে আসে। সাইরাকিউসের রাজা আর্কিমিডিসকে বললেন রাজ্যরক্ষার ব্যবস্থা করতে।

আর্কিমিডিস একটি মজার যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। যন্ত্রটি দিয়ে দূর থেকে বড় বড় পাথর ছুঁড়ে দেওয়া হ'ল শত্রুদের ওপর। শত্রুরা জব্দ হ'ল এবং তাদের বহু জাহাজ ডুবে গেল।

এই সময়ে আর্কিমিডিস দূর থেকে কয়েকখানি বড় বড় আয়নার সাহায্যে সূর্যরশ্মি শত্রুদের বাকি জাহাজগুলোর পালের ওপর ফেললেন।

প্রচণ্ড তাপে অনেকগুলো জাহাজ জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। শত্রুরা ভয় পেয়ে বাদ বাকি জাহাজগুলো নিয়ে দেশে ফিরে গেল, রাজ্যও রক্ষা পেল সেবারের মত।

কিন্তু অল্পদিন পরে রোমানরা আবার ফিরে এল! এবার তারা সাইরাকিউস দখল করল। শত্রুসৈন্য যখন নগর দখল করে, তখন আর্কিমিডিস এক জায়গায় বালির ওপর রেখা কেটে একটি সমস্যার সমাধানে তন্ময় হয়েছিলেন। একজন রোমান সৈন্য সেখানে উপস্থিত হয়ে আর্কিমিডিসের নাম জিজ্ঞাসা করল। কারণ,

তাদের সেনাপতি বলে দিয়েছিলেন, আর্কিমিডিসকে যেন হত্যা করা না হয়।

আর্কিমিডিস তাঁর সমস্যার সমাধানে এতই তন্ময় হয়েছিলেন যে তিনি তার কথার উত্তর না দিয়ে বললেন—"অপেক্ষা কর,



আর্কিমিডিস বললেন—"সাবধান, আমার দাগের ওপর পা দিও না।"

আমার সমস্যার সমাধান হলেই বলব। সাবধান, আমার দাগের ওপর পা দিও না!"

বর্বর সৈন্যটি কিন্তু অপেক্ষা করল না। সে অস্ত্রের আঘাতে নির্মমভাবে হত্যা করল সেকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসকে!

গ্যালিলিও

ইটালি দেশ। সেই দেশের পিসা সহরের একটি গির্জা। গির্জার ভিতর থেকে ঝুলছে একটা ঝাড়লণ্ঠন। হাওয়ায় লণ্ঠনটি এদিকে থেকে ওদিকে দুলছে। একটি সতেরো বছরের বালক বসে বসে একমনে লক্ষ্য করছে।

বালকের মনে হ'ল ঝাড়লণ্ঠনের দোল বেশি হোক আর কম হোক—দোলন-কাল যেন সমান। বালক ভাবছে এই দোলনকাল মাপা যায় কি করে। ঘড়ি কিন্তু তখনো ছিল না।

বালকটির মাথায় চট করে এক বুদ্ধি এল। সে নিজের নাড়ী টিপে সময় ঠিক করতে লাগল। কিন্তু সে যা ভেবেছিল, তাই হ'ল—দোলন বেশি হোক আর কমই হোক দোলন-কাল একই থেকে যাচ্ছে।

এই ঘটনার অল্পদিন পরে বালক ছোট্ট একটি যন্ত্র তৈরি করে ফেলল। যন্ত্রটি দিয়ে মানুষের নাড়ীর গতি মাপা সম্ভব হ'ল। ডাক্তাররা চিকিৎসার কাজে যন্ত্রটি পেয়ে তাকে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। তার ঐ আবিষ্কার থেকে পেণ্ডুলামের ঘড়ির উদ্ভাবন হ'ল।

এই বালকটির নাম গ্যালিলিও।

১৫৬৪ সালে গ্যালিলিওর জন্ম। তিনি বিনা বিচারে কোন কিছুই মেনে নিতেন না। তাঁর প্রতিভা ছিল অসাধারণ। পিসা

বিশ্ববিদ্যালয়ের যখন তিনি ছাত্র, তখন সেখানে গণিতের এক অধ্যাপক এলেন বক্তৃতা দিতে। গ্যালিলিও গণিতের ছাত্র ছিলেন না। তাই ক্লাসের বাইরে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে তিনি অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনে যেতে লাগলেন। একদিন সাহস করে তিনি সেই অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করলেন। অধ্যাপক তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে বিস্মিত হলেন এবং তাঁকে গণিতের ছাত্র করে নিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই গ্যালিলিও গণিতজ্ঞরূপে খ্যাতি লাভ করলেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটি ঘটনা গ্যালিলিওকে আরও বিখ্যাত করল। তিনি তখন এখানকার অধ্যাপক।

আগেকার বিজ্ঞানীরা বলতেন—ওপর থেকে যদি একটা ভারী বল ও একটা হালকা বল একসঙ্গে ছেড়ে দেওয়া যায়, তবে ভারী বলটাই আগে মাটিতে পড়বে। যে জিনিস যত ভারী হবে, তা তত বেশি দ্রুত নীচে পড়বে—এই ছিল তাঁদের বিশ্বাস।

গ্যালিলিও বললেন, তা হতে পারেনা, বল দুটো একসঙ্গেই পড়বে মাটিতে।

কিন্তু বললেই তো হবে না—পরীক্ষা করে দেখানো চাই।

পরীক্ষার ব্যবস্থা হ'ল। গ্যালিলিও একটা উঁচু মিনারের ওপর উঠে একটা ছোট বল আর তার একশ' গুণ ভারী আর একটা বল একসঙ্গে ছাড়লেন। নীচে উপস্থিত ছিল বহু দর্শক। তারা নিজের চোখেই দেখল, বল দুটো সত্যি একসঙ্গেই মাটিতে

পড়ল, শব্দও হ'ল একই সঙ্গে। এতদিনের একটা ভুল ধারণা গ্যালিলিও ভেঙ্গে দিলেন।

কিন্তু নিজের চোখে এই পরীক্ষা দেখেও অনেক লোক তাদের পূর্ব ধারণা ত্যাগ করল না। তাদের যুক্তি, একখানা বাঁশপাতা ও একখানা কাঁসার থালা তো একসঙ্গে পড়ে না। বাঁশপাতা হ'ল পাতলা, বাতাস তাকে ভাসিয়ে রেখে বাধা দেয় এটা তাদের মাথায় আসে নি। বাতাসহীন স্থানে বাঁশপাতা ও থালা একসঙ্গেই পড়বে।

যাই হোক, তারা গ্যালিলিওর সঙ্গে শত্রুতা করতে লাগল। অবশেষে তাদের শত্রুতার জন্য পিসা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্যালিলিওর চাকরি গেল। অবশ্য অন্য জায়গায় তিনি ভাল চাকরি পেয়ে গেলেন।

দূরবীন-যন্ত্রের সাহায্যে দূরের জিনিস কাছে দেখা যায়। এই দূরবীনও গ্যালিলিওর আবিষ্কার। দূরবীনের সাহায্যে তিনি আকাশের অনেক রহস্য আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্রের উন্নতি সাধন করে গ্যালিলিও চাঁদের মধ্যে দেখতে পেলেন বড় বড় পাহাড় আর গর্ত। খালি চোখে এগুলিকে আমরা কালো কালো দাগরূপে দেখি এবং 'চাঁদের কলঙ্ক' বলে থাকি। পূর্বে আকাশের ছায়াপথ-সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত ছিল। গ্যালিলিও দূরবীনের সাহায্যে দেখতে পেলেন, ছায়াপথ অসংখ্য নক্ষত্রের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের এতকালের ধারণা গেল পাল্টে।

দূরবীন নিয়ে, রাতের পর রাত গ্যালিলিও তাকিয়ে থাকতেন আকাশের দিকে। বড় দূরবীনের সাহায্যে তিনি দেখতে পেলেন আমাদের পৃথিবীর যেমন একটি চাঁদ আছে, বৃহস্পতি-গ্রহেরও তেমনি চারটি চাঁদ আছে। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহেরা যে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, তিনি দূরবীনের সাহায্যে তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ



দূরবীনের সাহায্যে...রহস্য আবিষ্কার করলেন গ্যালিলিও।

করলেন। দূরবীনের সাহায্যে তিনি জ্যোতিষ্কদের সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করলেন। এই নূতন যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার বেড়ে গেল।

মানুষ কিন্তু তার পুরানো ধারণা সহজে ছাড়তে চায় না। তাই গ্যালিলিওর আবিষ্কারের কথা তারা সহজে বিশ্বাস করতে

রাজী হয়নি। শাস্ত্রে যে কথা লেখা আছে, তার বিপরীত কথা বলাতে গ্যালিলিওর শত্রুরা তাঁকে বিচারালয়ে অভিযুক্ত করল। বিচারে তাঁর প্রতি আদেশ হ'ল, তিনি যদি তাঁর নূতন আবিষ্কারের কথা প্রচার করেন, তবে তাঁকে কারাগারে পাঠান হবে।

গ্যালিলিও তাঁর আবিষ্কারের কথা প্রচার করবেন না বলে চলে এলেন, কিন্তু পরে তিনি শাস্ত্রের কথা খণ্ডন করে নিজের আবিষ্কৃত সিদ্ধান্তের কথাই প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। ফলে, তাঁকে আটক করা হ'ল। এই অবস্থায় তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। তিনি হলেন অন্ধ ও বধির। যে বিশ্বজগৎ-সম্বন্ধে তিনি আবিষ্কার করলেন নূতন নূতন সত্য, তা চিরদিনের জন্য তাঁর কাছে হ'ল শব্দহীন, বর্ণহীন ও চির-অন্ধকারে বিলীন!

এই অবস্থাতেও এই মহাবিজ্ঞানী তাঁর গবেষণা থেকে বিরত হন নি। তিনি একটি ঘড়ি তৈরির কৌশল এই অন্ধ-বধির অবস্থাতেই তাঁর পুত্রকে শিখিয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু ঘড়ি তৈরি হওয়ার আগেই তিনি এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করলেন।

১৬৪২ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরেও তাঁর শত্রুরা তাঁকে সম্মান দেয় নি। পরে অবশ্য সারা বিশ্ব তাঁকে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী বলে স্বীকার করেছে।

নিউটন

ইংল্যাণ্ডের একটি গ্রাম। সন্ধ্যাবেলা চাষীরা ফিরছে মাঠের কাজ সেরে। এমন সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা দেখতে পেল, তারার মত উজ্জ্বল একটা অস্বাভাবিক আলো। চাষীরা মনে করল ওটা নিশ্চয়ই একটা ধূমকেতু। তাদের ভয় হ'ল। একটা যুদ্ধ কিংবা মহামারী না হয়ে আর যায় না। সেই অমঙ্গলেরই সূচনা করেছে ঐ ধূমকেতুটি।

আসলে কিন্তু ওটা ধূমকেতু নয়।

সেই গ্রামের আইজাক নিউটন নামে একটি চাষীর ছেলে ঘুড়ির ল্যাজে কাগজের ঠোঙার মধ্যে একটা বাতি জ্বালিয়ে আকাশে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। আসল ব্যাপারটা জেনে সকলে আইজাকের বুদ্ধির তারিফ করতে লাগল।

আইজাক নিউটনের জন্ম হয় ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের এক চাষী পরিবারে। লেখাপড়ায় নিউটন ছেলেবেলায় মোটেই ভাল ছিলেন না। স্কুলে একদিন এক কাণ্ড ঘটে গেল। ক্লাসের একটি ছেলের সঙ্গে নিউটনের হ'ল মারামারি। ছেলেটি লেখাপড়ায় নিউটনের চেয়ে ছিল ভাল। তাই সকলে নিউটনেরই নিন্দা করল।

এই ঘটনার পর নিউটন প্রতিজ্ঞা করলেন, লেখাপড়ায় সে ছেলেটির চেয়ে ভাল হবেনই। অল্পদিনের মধ্যেই আইজাক একজন ভাল ছেলে হয়ে উঠলেন।

ছেলেবেলা থেকেই কলকব্জার কাজে আর নূতন নূতন আবিষ্কারে নিউটনের ছিল মহা উৎসাহ। মাটির ওপর কাঠি পুঁতে তিনি একটি সূর্যঘড়ি তৈরি করে ফেললেন। কাঠির ছায়া দেখেই তিনি বলে দিতে পারতেন ক'টা বেজেছে। অল্পদিনের মধ্যে তিনি একটা অদ্ভুত জলঘড়িও তৈরি করে ফেললেন। উঁচু জায়গায় রাখা একটা পাত্র থেকে জল পড়ত আর তাতেই চলত ঘড়িটা।

চাষীর ছেলে চাষী হবে ভেবে নিউটনকে মাঠে পাঠানো হ'ল গোরুর রাখালি করতে। কিন্তু কে রাখালি করে। তিনি সারাদিন তাঁর কলকব্জার পরীক্ষা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন।

অবশেষে উনিশ বছর বয়সের সময় নিউটনকে পাঠানো হ'ল কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। কেম্‌ব্রিজে এসে তিনি প্রথমটা ভাল ফল করতে পারলেন না। জ্যামিতিতে তিনি মোটেই ভাল নম্বর পেলেন না। কিন্তু কোন বিষয়ে কাঁচা থাকার ছেলে তিনি নন। পরবর্তী জীবনে তিনিই গণিতে নূতন নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। সে সব পদ্ধতি আজও চলেছে।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় বাগানে বসে নিউটন গভীর ভাবে চিন্তা করছিলেন, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে কেন। আকাশে চাঁদের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হ'ল চাঁদই বা পৃথিবীর চারদিকে চিরকাল একই ভাবে ঘুরছে কেন! এমন সময় টুপ করে গাছ থেকে একটি পাকা আপেল মাটিতে পড়ল। আপেলটা পড়তে দেখে তাঁর মনে নানা প্রশ্ন এল।— তিনি বুঝলেন, ওপরের কোন

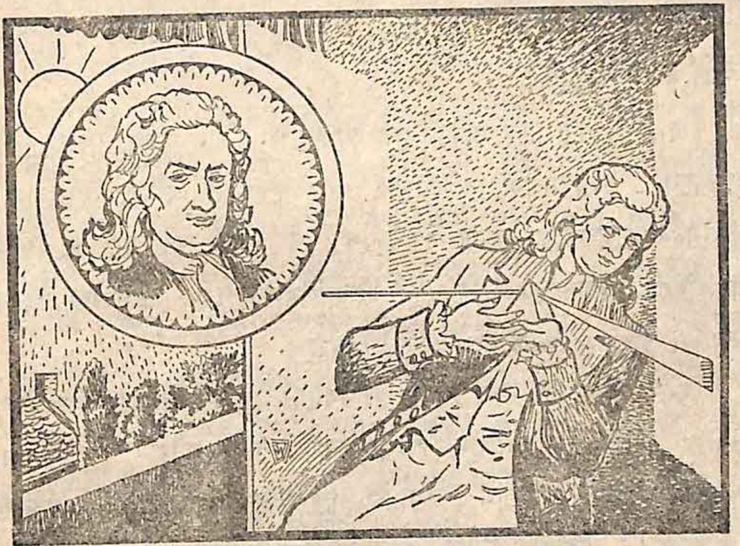
বস্তুর প্রতি পৃথিবীর একটা অদৃশ্য আকর্ষণ আছে। তার জন্যই হয়তো চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে এবং এই একই নিয়মে সূর্যের আকর্ষণে পৃথিবীও সূর্যের চারদিকে ঘুরছে।

এরপর নিউটন আবিষ্কার করলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রত্যেক পদার্থ অপর পদার্থকে আকর্ষণ করছে! চন্দ্রসূর্য, গ্রহনক্ষত্র সব কিছুর মধ্যেই এই আকর্ষণ আছে। নিউটনের আবিষ্কৃত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই নিয়মটির নাম 'মহাকর্ষ'।

এই মহাকর্ষ-নিয়ম প্রয়োগ করে নিউটন চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ ও ধূমকেতুর গতিপথ অঙ্ক কষে স্থির করলেন। মহাকর্ষ-শক্তির জন্যই যে সমুদ্রে জোয়ার-ভাঁটা হয়, তাও জানা গেল। কিন্তু গোলমাল বাধল ইউরেনাস গ্রহকে নিয়ে। এই নিয়ম-অনুযায়ী তার যে পথ দিয়ে চলা উচিত, সে পথ দিয়ে সে চলে না। নিউটন ভেবে পান না কেন এমন হয়। তবে কি তাঁর মহাকর্ষ-নিয়ম ভুল! অনুমান করা হ'ল, ইউরেনাসের কাছাকাছি অবস্থিত অন্য কোন অদৃশ্য গ্রহের আকর্ষণের ফলেই এমন হচ্ছে। এই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে দূরবীন দিয়ে ভাল করে লক্ষ্য করা হ'ল। সত্যিই তো! ঐ তো আর একটি গ্রহ রয়েছে! এইভাবে নেপচুন গ্রহটি আবিষ্কৃত হ'ল ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে। নিউটনের মহাকর্ষ-নিয়ম নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হ'ল।

আলো-সম্বন্ধেও নিউটন নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করেন। তিনি পরীক্ষা করে বের করলেন সূর্যের আলোকে প্রধানতঃ সাতটি রং আছে এবং সূর্যের সাদা আলো নানা রঙের আলোর সমষ্টি।

নিউটন বহু নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করে মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন। কিন্তু তিনি তাঁর আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করতে কখনও ব্যস্ত হননি। লোকচক্ষুর অন্তরালে চলত তাঁর জ্ঞানের সাধনা। তাঁর বহু আবিষ্কারের কথা তিনি অনেকদিন গোপন রেখেছিলেন।



নিউটন পরীক্ষা করে দেখলেন, সূর্যের সাদা আলো নানা রঙের আলোর সমষ্টি।

নিউটন ছিলেন ধীর, স্থির, শান্ত ও আপনভোলা জ্ঞানী। দীর্ঘ জীবনব্যাপী বহু নূতন আবিষ্কারের পরেও এই বিনয়ী বিজ্ঞানী বলেছিলেন—"সম্মুখে আমার অসীম জ্ঞানসমুদ্র, আমি তার কিছুই জানি না! আমি সেই সমুদ্রের তীরে ছোট ছেলের মত কয়েকটি রঙীন নুড়ি কুড়িয়েছি মাত্র।"

ল্যাভয়সিয়ে

যথাযথ মাপজোখ আর চুলচেরা সূক্ষ্ম হিসাব না হলে বিজ্ঞানের গবেষণা চলে না। ল্যাভয়সিয়ের আগে রসায়ন-শাস্ত্রের চর্চা চলে আসছিল বটে, কিন্তু তার মধ্যে সূক্ষ্ম হিসাবের ছিল বড়ই অভাব।

ল্যাভয়সিয়ে এই অভাব দূর করেন। তিনি সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডের সাহায্যে রসায়ন-বিদ্যার বিচার ও গবেষণা আরম্ভ করলেন। রসায়ন-শাস্ত্রে তাঁর দানের পরিমাণ খুব বেশী না হলেও তিনি যা দিয়ে গিয়েছেন, তা এই বিদ্যার মূলকথা। এইজন্য তাঁকে রসায়ন-শাস্ত্রের জনক বলা যেতে পারে।

ফরাসী দেশের এক ধনী পরিবারে ল্যাভয়সিয়ের জন্ম হয় ১৭৪৩ সালে। প্যারিস শহরে যখন তিনি আইন পড়ছিলেন, তখন সেখানে তিনি রসায়ন-শাস্ত্র-সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা শোনেন। এরপর তিনি এই শাস্ত্রের দিকে আকৃষ্ট হন এবং নানারকম গবেষণা আরম্ভ করেন।

ল্যাভয়সিয়ের আগে রসায়নবিদ্‌গণ বলতেন, প্রত্যেক দাহ্য পদার্থের মধ্যে থাকে দুটি অংশ—ভস্ম ও ফ্লজিস্টন। আগুনে ফ্লজিস্টন বেরিয়ে যায়, পড়ে থাকে ভস্ম। প্রিস্টলি নামে একজন রসায়নবিদ্‌ বায়ু থেকে একটি গ্যাস বের করেন। প্রিস্টলি বলেন, গ্যাসটি ফ্লজিস্টন-বর্জিত বায়ু। তিনি ল্যাভয়সিয়েকে

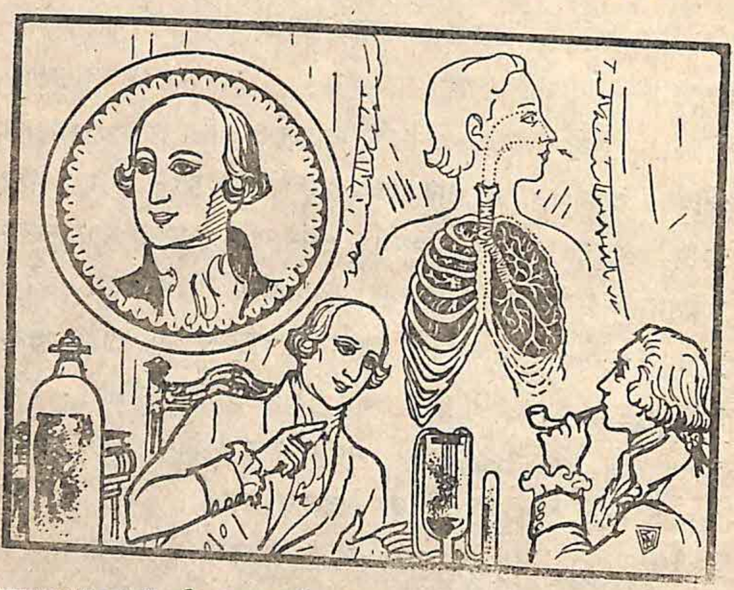
বললেন, এই বায়ু মানুষের প্রাণধারণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তিনি দেখিয়ে দিলেন, এই গ্যাসে জ্বলন্ত মোমবাতি বেশি উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে ওঠে।

প্রিস্টলি দেখিয়াছিলেন, পারাকে গরম করলে লাল গুঁড়োতে পরিণত হয়। আবার, সেই লাল গুঁড়োকে গরম করলে ফ্লজিস্টন-বর্জিত বায়ু বের হয়! ল্যাভয়সিয়েও অন্যভাবে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন; তিনি নিক্তিতে ওজন করে দেখালেন, পরীক্ষার পরে লাল গুঁড়োর ওজন কম্‌ল এবং যতটা কম্‌ল ঠিক ততটা ওজনের গ্যাস বেরুল। তিনি এই গ্যাসের নাম দিলেন অক্সিজেন। আবদ্ধ বায়ুতে পারা গরম করে তিনি লাল গুঁড়ো তৈরি করলেন। এখানেও তিনি দেখালেন যে, পারার ওজন যতটা বাড়ল, আবদ্ধ বায়ুর ওজন ঠিক ততটা কমল! তখন ল্যাভয়সিয়ে দহন-সম্বন্ধে এই নূতন তথ্য আবিষ্কার করলেন যে, কোন ধাতুকে গরম করলে তা ওজনে বাড়ে। কারণ, উত্তপ্ত অবস্থায় ঐ ধাতু বায়ু থেকে কিছুটা অক্সিজেন নিয়ে নেয়। এই তথ্য-আবিষ্কারের পর ফ্লজিষ্টন-তত্ত্ব বাতিল হয়ে যায়।

শ্বাসকার্যের ফলে বায়ুর পরিবর্তন ঘটে, ল্যাভয়সিয়ে তারও নানারকম পরীক্ষা করলেন। তিনি বললেন, শ্বাসক্রিয়ার দ্বারা আমরা বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ করি ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ত্যাগ করি।

দহনে ও শ্বাসকার্যে অক্সিজেনের ভূমিকা নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করেন ল্যাভয়সিয়ে। তিনিই এর এই নামকরণ করেন।

নানা পরীক্ষা ও গবেষণার পরে ল্যাভয়সিয়ে বললেন, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নূতন কিছুই সৃষ্ট হয় না ; পদার্থের এক দিকে যা যায়, অন্যদিকে তা আসে। পদার্থের ওজনের নিত্যতা-সম্বন্ধে তাঁর এই সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান-জগতে একটি শ্রেষ্ঠ দান।



দহনে ও শ্বাসকার্যে অক্সিজেনের ভূমিকা নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করেন ল্যাভয়সিয়ে।

ল্যাভয়সিয়ের মৃত্যুকাহিনী বড় করুণ। তিনি তাঁর দেশের এমন একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মী ছিলেন, যে প্রতিষ্ঠান লোকের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করত। ফরাসী বিপ্লবের সময় এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। বিচারে তাঁর ফাঁসীর আদেশ হয়।

———

হামফ্রি ডেভি

মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে হামফ্রি ডেভি স্কুল ছাড়ার পর বেকার অবস্থায় বাড়ীতে বসে আছেন, এমন সময় হ'ল তাঁর পিতৃবিয়োগ। সংসার অচল হয়ে উঠল। কাজেই তাঁকে চাকরির চেষ্টা করতে হ'ল। চাকরি পেয়েও গেলেন একটা। একজন বিজ্ঞানী নানারকম গ্যাস নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। ডেভি হলেন তাঁর সহকারী।

ডেভি সেই বিজ্ঞানীর কাজে সাহায্য করেন আর নিজেও কিছু কিছু গবেষণা করেন।

ডেভি নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। এই গ্যাসকে আগে অত্যন্ত বিষাক্ত মনে করা হ'ত। ডেভি সাহস করে একদিন এই গ্যাস নিজেই গ্রহণ করলেন। তারপর তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

সেই অবস্থায় তাঁর মনে হতে লাগল, তিনি যেন এক কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করছেন আর মাঝে মাঝে খুব জোরে হাসছেন। জ্ঞান যখন ফিরে এল, তখন তিনি দেখলেন যে, তিনি বেশ সুস্থই আছেন।

এই গ্যাসের নাম দেওয়া হ'ল হাসির গ্যাস বা লাফিং গ্যাস।

আবিষ্কারের কথা প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডেভি বিজ্ঞানজগতে খ্যাতি লাভ করেন।

এরপর তিনি তাপ-সম্বন্ধে নানা গবেষণা করেন। দু'খানা ধাতুর পাত ঘসে তিনি যে তাপের সৃষ্টি করলেন, তা দিয়ে জল ফোটানো গেল।

এর কিছুদিন পরে তিনি গবেষণা আরম্ভ করলেন তড়িৎ-প্রবাহ নিয়ে। এ সম্বন্ধে পরীক্ষা তখন অবশ্য চলছিল।

ডেভি ব্যাটারি তৈরি করে তাতে তার লাগিয়ে সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক আলো জ্বালালেন।

লোক অবাক হ'ল আকাশের বিদ্যুৎকে তারের মধ্যে জ্বলতে দেখে।

এই সব পরীক্ষার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তিনি নানা বিষয়ে নূতন নূতন গবেষণা করতে লাগলেন।

জলের মধ্যে তড়িৎ চালিয়ে তিনি দেখলেন যে জলের দুটি উপাদান—একটি অক্সিজেন এবং অপরটি হাইড্রোজেন।

সোডার মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ পাঠিয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন সোডিয়াম ধাতু। ইউরোপের চারদিকে ডেভির নাম ছড়িয়ে পড়ল।

তবে ডেভির সবচেয়ে কল্যাণকর আবিষ্কার হ'ল 'সেফ্‌টি ল্যাম্প'।

কয়লা-খনির মধ্যে এক রকমের গ্যাস জমে। আগুনের সংস্পর্শে সেই গ্যাস হঠাৎ উঠত জ্বলে, এবং তার ফলে কয়লা-খনির কত লোকের যে জীবন নাশ হয়েছে, তার ঠিক নাই।

ডেভি এক রকমের বাতি তৈরি করলেন। এই বাতির নাম দেওয়া হ'ল সেফ্‌টি ল্যাম্প।

সেফ্‌টি ল্যাম্প বেশি উত্তপ্ত হতে পারত না। ফলে, খনির মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠার সম্ভাবনা দূর হ'ল।



সেফ্‌টি ল্যাম্প আবিষ্কারের ফলে·· ···রক্ষা পেয়েছে।

আজকাল এই সেফ্‌টি ল্যাম্প কয়লা-খনিতে ব্যবহৃত হয়।

ডেভির এই আবিষ্কারের ফলে কয়লা-খনির হতভাগ্য শ্রমিকরা হঠাৎ আগুন লেগে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে চিরদিনের মত।

মাইকেল ফ্যারাডে

বাপ কামার আর মা এক চাষীর মেয়ে। এমনি বাপমায়ের ছেলে মাইকেল ফ্যারাডে ছিলেন অতি দরিদ্র। কোনদিন খাবার জোটে, কোনদিন বা দাতব্য ভাণ্ডার থেকে ভিক্ষে করে খাবার আনতে হয়। ছোট নোংরা ঘর, সকলের শোয়ার জায়গা হয় না, তাই লণ্ডন শহরের ফুটপাতে শীতে কুঁকড়ে রাত কাটাতে হয়। বাল্যকালটা এইভাবেই কেটেছে উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডের।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডে তাঁর জন্ম হয়। তিনি লেখাপড়া শিখতে পেরেছিলেন অতি সামান্য।

তেরো বছর বয়সের সময় মাইকেল কাজ পেয়ে গেলেন এক দপ্তরিখানায়। ঘর ঝাঁট দেওয়া, জুতা পরিষ্কার করা, সংবাদ-বাহকের কাজ সব কিছুই করতে হ'ত তাঁকে। কিছুদিন পরে তাঁকে শেখানো হ'ল বই বাঁধানোর কাজ। মাইকেল বই বাঁধেন আর অবসর-সময়ে সেই সব বই পড়েন। বিজ্ঞানের বই পড়তেই তাঁর ভাল লাগত বেশী।

সেই সময়ে লণ্ডন শহরে বড় বড় বিজ্ঞানীরা বক্তৃতা দিতেন। তিনি টিকিট কিনতেন আর বিজ্ঞানীদের বক্তৃতা শুনতেন। বক্তৃতা যা শোনেন, মাইকেল নোট-খাতায় তা লিখে রাখেন। এমনি করে কয়েকখানি খাতা ভরে গেল তাঁর।

একবার লণ্ডনের রয়াল ইনষ্টিটিউটে বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন তখনকার বিখ্যাত বিজ্ঞানী হাম্‌ফ্রি ডেভি। মাইকেল গেলেন সেখানে। ডেভির বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়ে ফিরে এলেন মাইকেল। বাড়ীতে এসে বক্তৃতার কথা টুকে রাখলেন খাতায়। নক্সাও আঁকলেন যথাযথ স্থানে। মাইকেল পণ করলেন, যেমন করে হোক তিনি আজীবন বিজ্ঞানের সেবা করবেন। সেই উদ্দেশ্যে রয়াল ইনৃষ্টিটিউটে যে কোন কাজ প্রার্থনা করে তিনি আবেদন জানালেন। কিন্তু কোন ফল হ'ল না। অবশেষে সরাসরি ডেভির কাছেই জানালেন তাঁর আবেদন।

ডেভি ছিলেন গুণগ্রাহী। তিনি বুঝলেন, এই যুবকের দ্বারা মানুষের উপকার হবে। ফ্যারাডের প্রার্থনা তিনি মঞ্জুর করলেন। ডেভি যদি সেদিন তাঁর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করতেন, তবে মাইকেল ফ্যারাডের প্রতিভা হয়তো প্রকাশের পথ পেত না এবং তার ফলে মানুষের সভ্যতাও পড়ত অনেক পেছিয়ে।

মাইকেল রয়াল ইনৃষ্টিটিউটে ডেভির সহকারী নিযুক্ত হলেন এবং তাঁর সঙ্গে দু'বছর নানাস্থানে ভ্রমণ করলেন। এই সময় বহু বিজ্ঞানীর গবেষণা-সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার সুযোগ তিনি পেলেন। এর পর লণ্ডনে ফিরে এসে তিনি স্বাধীনভাবে গবেষণা আরম্ভ করলেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁর নানা আবিষ্কারের কথা প্রচারিত হ'ল। ফ্যারাডের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

বিজ্ঞান-জগতে তড়িৎ-চুম্বক-সম্বন্ধে ফ্যারাডের দানই তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। যে উপায়ে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন

Acc. no. - 14975

করে আজকাল বড় বড় শহর আলোকিত করা হয়, কল-কারখানা, ট্রাম, ট্রেন, জাহাজ ইত্যাদি চালানো হয়, পাখা ঘোরানো হয়, তার উদ্ভাবক মাইকেল ফ্যারাডে।

তড়িৎ-চুম্বক-সম্বন্ধে যেদিন তিনি তাঁর পরীক্ষা করেন, সেদিন সভায় বহু বিজ্ঞানী ও গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন।



বিনা সেলেই তড়িৎ প্রবাহ··· ···অবাক।

শুধু একটা তারের কুণ্ডলী ও আর একটা চুম্বকদণ্ড নিয়ে ফ্যারাডে তড়িৎপ্রবাহ-সম্বন্ধে তাঁর পরীক্ষা দেখানোর জন্য উপস্থিত হয়েছেন। কোন ব্যাটারি বা সেল ছিল না। ফ্যারাডে চুম্বকদণ্ডটি তারের কুণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করালেন, আর অমনি তারের মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি হ'ল। দণ্ডটি যখন

তিনি বের করে নিলেন, তখন তড়িৎপ্রবাহ বিপরীত দিকে চলে গেল। বিনা সেলেই তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হতে দেখে বিজ্ঞানীরা অবাক। কিন্তু অন্য যাঁরা সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের কাছে এই পরীক্ষাটি তেমন কিছু মূল্যবান ব'লে মনে হ'ল না।

ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীও দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ফ্যারাডেকে বললেন,—"আপনার পরীক্ষা তো দেখলাম, কিন্তু এ মানুষের কোন্ কাজে আসবে ?"

ফ্যারাডে বললেন,—"মন্ত্রী মহাশয়, হয়তো এমন একদিন আসবে, যখন এর দ্বারা আপনি লোকের কাছ থেকে অনেক কর আদায় করতে পারবেন।"

ফ্যারাডের কথা সত্যি হয়েছিল। আজকাল বড় বড় ডায়নামোয় যে প্রচুর শক্তিশালী তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়, তার দ্বারা নানা কাজ করা হয়। বড় বড় কলকারখানা, ইঞ্জিন, টেলিফোন, রেডিও—সবই সেই তড়িৎশক্তির দ্বারা চলছে। শুধু কর আদায় নয়—মাইকেল ফ্যারাডের আবিষ্কারের ফলেই মানুষের সভ্যতা আজ এতদূর এগিয়ে আসতে পেরেছে।

———

চার্লস ডারউইন

পৃথিবীতে জীবজন্তু, গাছপালা প্রভৃতির উৎপত্তি কেমন ক'রে হ'ল—এ প্রশ্ন মানুষ চিরদিনই করে আসছে। এ সম্বন্ধে নানাশাস্ত্রে নানা মত প্রচলিত আছে। কিন্তু ঐ সব মতের অধিকাংশই কাল্পনিক।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জীবের উৎপত্তি-সম্বন্ধে চার্লস ডারউইনের মতবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এক মহা আন্দোলনের সৃষ্টি হয়।

চার্লস ডারউইনের জন্ম হয় ইংলণ্ডে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে। বাল্যকাল থেকেই গাছপালা, পাখী, পোকামাপড়, জীবজন্তু-সম্বন্ধে ছিল তাঁর প্রবল কৌতূহল এবং এসব পর্যবেক্ষণ করতে তাঁর খুব ভাল লাগত। পিতার ইচ্ছানুযায়ী ধর্মযাজক হওয়ার জন্য তিনি শিক্ষালাভ করেন, কিন্তু পাদরীর জীবন-যাপনে তাঁর কোন উৎসাহ ছিল না। উদ্ভিদ ও জীবজন্তু-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের ইচ্ছাই ছিল তাঁর প্রবল।

ডারউইন তাঁর চিরদিনের ইচ্ছা পূর্ণ করার সুযোগও পেয়ে গেলেন হঠাৎ। একখানি জাহাজ এই সময়ে পৃথিবীর নানা দেশে যাবে। সেই জাহাজের জন্য জীববিদ্যায় আগ্রহশীল একজন লোকের দরকার। ডারউইন আবেদন করলেন। আবেদন মঞ্জুর হ'ল।

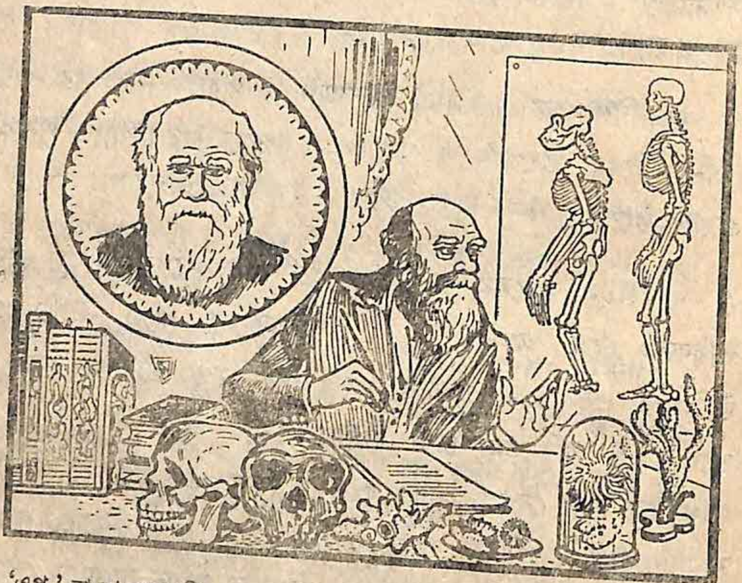
কয়েক বছর ধরে ডারউইন সেই জাহাজে পৃথিবীর নানাস্থানে ঘুরলেন, বহু প্রাণী ও গাছপালা পর্যবেক্ষণ করলেন এবং তাদের নমুনাও সংগ্রহ করলেন অনেকগুলি। অবশেষে দেশে ফিরে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে—নানা চিন্তা ও গবেষণা করতে লাগলেন।

দীর্ঘ বিশ বছর ধরে নানা অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি জীবের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ-সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশ করেন।

ডারউইন বললেন, প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে যুগ যুগ ধরে পরিবর্তন চলে আসছে। এই পরিবর্তনের ফলে প্রাণী ও উদ্ভিদের এক এক প্রজাতি অন্য প্রজাতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। তবে এই পরিবর্তন চলে দীর্ঘকাল ধরে অতি ধীরে ধীরে। পৃথিবীতে পূর্বে যে সব আদিম প্রজাতি ছিল, এই নিয়মের ফলেই তারা লোপ পেয়েছে, আর তাদের স্থলে দেখা দিয়েছে নূতন প্রজাতি। যে সমস্ত প্রাণী ও জীবজন্তু জীবন-সংগ্রামে বেঁচে থাকার যোগ্য, তারাই বেঁচে থাকে, অযোগ্য প্রাণীরা লোপ পায়। প্রকৃতি এইভাবে যোগ্যতর প্রাণীদের বাঁচিয়ে রাখছে। এই হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়ম।

মানুষের ক্রমবিকাশ-সম্বন্ধে ডারউইন বললেন, 'এপ্' বা বানর-জাতীয় লাঙ্গুলবিহীন এক শ্রেণীর জীব থেকেই ঘটেছে মানুষের ক্রমবিকাশ।

ডারউইনের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হ'ল। কারণ, মানুষের উৎপত্তি-সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে সব কথা লেখা আছে, ডারউইনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে তার কোন মিল নেই।



'এপ্' বা বানরজাতীয় একশ্রেণীর······মানুষের ক্রমবিকাশ। (পৃঃ ২৫)

ডারউইনের সিদ্ধান্তকে তারা অবশ্য কোন যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করতে পারল না। যা সত্য, বিজ্ঞান তাই বলে, এবং এইজন্যই বিজ্ঞানেরই জয় হয় চিরদিন। এ সম্বন্ধে আজও নানা অনুসন্ধান ও গবেষণা চলছে।

পার্কিন

এক জিনিসের গবেষণা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা অন্য জিনিস আবিষ্কার ক'রে ফেলেছেন—এমন দৃষ্টান্ত বহু আছে। পার্কিনের ক্ষেত্রেও হয়েছিল ঠিক তাই। আঠার বছর বয়সের সময় পার্কিন পরীক্ষা আরম্ভ করলেন সিন্‌কোনা গাছ ছাড়া শুধু রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে কুইনাইন তৈরী করা যায় কিনা।

কুইনাইন তিনি তৈরি করতে পারলেন না বটে, কিন্তু পরীক্ষা করতে গিয়ে লাল রঙের একটি পদার্থ তিনি বের করলেন এবং তা থেকে শেষে বেগুনি রঙের এক রকমের জিনিস তৈরি ক'রে ফেললেন। এই জিনিসের নাম 'মভ'। মভ একপ্রকার রঞ্জন-দ্রব্য। এ দিয়ে কাপড়-চোপড় রঙ করা চলে।

মভ আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে উদ্ভিজ্জাত পদার্থ থেকেই রঞ্জন-দ্রব্য প্রস্তুত হ'ত। পার্কিনের কৃত্রিম রং মভের আবিষ্কারের কথা প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীদের মধ্যে কৃত্রিম রং তৈরি করার জন্য সাড়া পড়ে গেল। কৃত্রিম ম্যাজেণ্টা আবিষ্কৃত হ'ল ফরাসী দেশে। জার্মানির বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম নীল রঙ আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের পর ভারতবর্ষ থেকে ধীরে ধীরে নীলের চাষ উঠে গেল। আজ পর্যন্ত বহু কৃত্রিম রঞ্জন-দ্রব্য তৈরি হয়েছে, কিন্তু এই সব আবিষ্কারের প্রথম পথ দিয়ে যান পার্কিন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে পার্কিনের মৃত্যু হয়।

রন্‌টগেন

হাত-পা ভেঙ্গে গেলে, কোথায় হাড় ভেঙেছে এক্‌সরে ফটো তুলে তা জানতে পারা যায়। দেহের ভেতর ফুসফুস্‌, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি ঠিক আছে কিনা তা জানবার জন্য ডাক্তাররা এক্‌সরে ফটো নিয়ে থাকেন। যে জিনিস বাইরে থেকে চোখে দেখা যায় না, এক্‌সরে-আবিষ্কারের ফলে তারও ফটো তোলা সম্ভব হয়েছে।

এই বিস্ময়কর আবিষ্কারটি হয়েছে কিন্তু নিতান্ত আকস্মিকভাবে।

এক্‌সরে-রশ্মির আবিষ্কারক রন্‌টগেন জন্মগ্রহণ করেন ইউরোপের প্রুশিয়া শহরে। ফটো তোলা ছিল তাঁর সখ। লেখাপড়া শিখে তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরম্ভ করেন।

সেই সময়ে তড়িৎপ্রবাহ-সম্বন্ধে ইউরোপের নানাদেশে পরীক্ষা চলছিল। রন্‌টগেনও এ সম্বন্ধে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। তড়িৎপ্রবাহ যখন বায়ুর মধ্য দিয়ে চলে, তখন বায়ু তড়িৎপ্রবাহকে বাধা দেয়, কিন্তু একটা বায়ুশূন্য কাচের পাত্রে তড়িৎপ্রবাহ পাঠালে কি হয়, তা ভালভাবে পরীক্ষা করার জন্য রন্‌টগেন ব্যবস্থা করলেন। তিনি একটি বায়ুশূন্য কাচের বাল্‌ব তৈরি ক'রে তার ভেতর তড়িৎপ্রবাহ পাঠালেন এবং পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন।

যে টেবিলের ওপর তিনি পরীক্ষা করছিলেন, সেই টেবিলের ওপর ছিল কাগজে মোড়া একখানি ফটোগ্রাফি প্লেট। প্লেটখানি চাপা দেওয়া ছিল একটা মোটা বই দিয়ে আর সেই বই-এর মধ্যে ছিল একটা বড় চাবি। এ ছাড়াও আরো অনেক জিনিস-পত্র ছিল সেখানে।

রন্‌টগেনের ছবি তোলার সখ ছিল, তা আগেই বলেছি।

এই পরীক্ষার কয়েকদিন পরে বই-এর নীচের সেই প্লেটখানি নিয়ে বাইরের একটা ছবি তোলেন। প্লেটটা ডেভেলাপ ক'রে তিনি তার মধ্যে একটা চাবির ছায়া দেখতে পেলেন।

অবাক্ কাণ্ড! চাবির ছায়া এল কি ক'রে। তিনি যেখানকার ছবি তুলেছেন, সেখানে তো চাবি ছিল না। চাবির ছায়া কি করে প্লেটে এল, তা অনুসন্ধান করার জন্য তিনি আবার টেবিলের ওপর ঠিক আগের মত ক'রে সব জিনিস-পত্র সাজালেন।

ফটো তোলার প্লেট, তার ওপরে বই এবং বই-এর মধ্যে চাবি, সব কিছুই আগের মত ক'রে সাজানো হ'ল। এবার তিনি বায়ুশূন্য কাচের বাল্‌বের ভেতর তড়িৎপ্রবাহ পাঠালেন। তারপর প্লেটটা ডেভেলাপ ক'রে আগের মতই একটি চাবির ছায়া দেখে অবাক্ হ'লেন।

রন্‌টগেন ভাবলেন, তড়িৎ-প্রবাহের ফলে বাল্‌ব-এর ভেতর থেকে এক অদৃশ্য রশ্মি বের হ'য়ে বই-এর পাতা ভেদ ক'রে ভেতরকার চাবির ছবি তুলেছে।

এবার তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন এবং এই অদৃশ্য রশ্মিকে দেখার জন্য নানা জিনিসের ওপর পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। অবশেষে দেখলেন, এই অদৃশ্য আলো যখন বেরিয়ম প্লাটিনোসায়ানাইডের ওপর পড়ে, তখন তা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

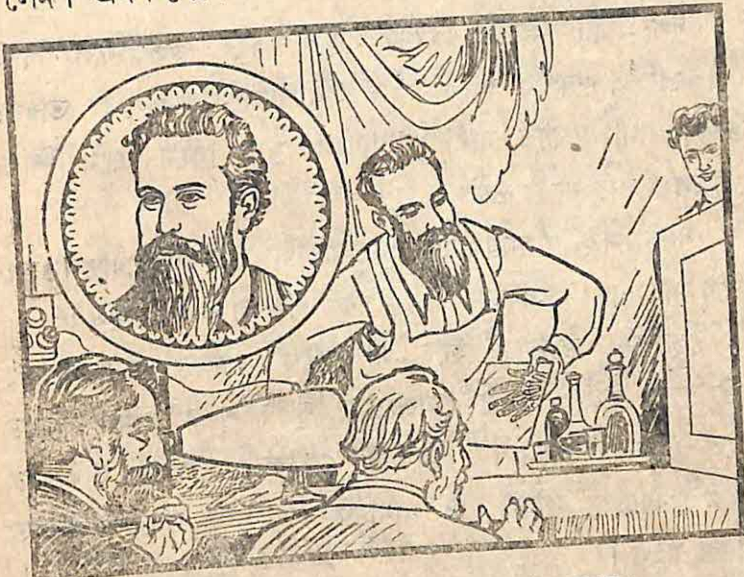
রন্‌টগেন এই আলোর নাম দেন X-Ray (এক্‌সরে) অর্থাৎ অজ্ঞাত রশ্মি। এই রশ্মি সাধারণ আলোর মত সব রকমের অস্বচ্ছ জিনিসে বাধা পায় না। এই আলো কোন কোন অস্বচ্ছ জিনিসকে ভেদ ক'রে যেতে পারে।

রন্‌টগেনের আবিষ্কারের কথা প্রচারিত হ'ল আর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়ে পড়লেন।

রন্‌টগেন এখন পরীক্ষা করে দেখতে চান, তাঁর এই নব-আবিষ্কৃত আলোটি বই-এর পাতার মত আর কি কি জিনিস ভেদ ক'রে যেতে পারে। তিনি দেখলেন, যে জিনিসের ঘনত্ব বেশি, তার ভেতর দিয়ে এই আলো তেমন যেতে পারে না। এই আলো তামা বা দস্তার পাত ভেদ করতে পারল না।

একদিন পরীক্ষা করতে গিয়ে রন্‌টগেন এই আলোর সামনে তাঁর হাত রাখলেন এবং লক্ষ্য করলেন যে, মাংস ভেদ করে এই আলো চলে গেল, কিন্তু হাড় ভেদ করে যেতে পারল না। এর ফলে প্লেটের ওপর হাড়ের ছায়া পড়ল!

এতদিনে মানুষের দেহের ভেতরকার হাড়ের ফটো তোলা সম্ভব হ'ল। ডাক্তাররা মানুষের এই হাড়ের ফটো দেখে অবাক হ'লেন। এখন থেকে তাঁদের চিকিৎসার কাজ অনেক সহজ হ'ল।



ডাক্তাররা মানুষের হাড়ের ফটো দেখে অবাক হলেন।

নানা কাজে বিশেষ ক'রে চিকিৎসাক্ষেত্রে এই আলো এখন ব্যবহৃত হচ্ছে।

এই আবিষ্কারের জন্য ১৯০০ খৃষ্টাব্দে রন্‌টগেনকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

টমাস আলভা এডিসন

দশ-এগার বছরের একটি ছোট ছেলে কতকগুলো খালি শিশিবোতল যোগাড় ক'রে একটি ঘরে সাজিয়ে রাখল। তারপর ডাক্তারখানা থেকে নানা রাসায়নিক দ্রব্য কিনে এনে শিশি-বোতলগুলোর মধ্যে ভরল।

সময় নেই, অসময় নেই, ছেলেটি দিন-রাত শিশিবোতলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে আর হরেক রকম পরীক্ষা ক'রে দেখে।

ছেলেটি ডাক্তার হবে না—হবে একজন রসায়নবিদ্। এই তার ইচ্ছা, কিন্তু রোজরোজ নূতন নূতন জিনিস কিনতে হ'লে টাকার দরকার। ছেলেটি সেইজন্য রেলের যাত্রীদের কাছে খবরের কাগজ ও নানারকম পত্রিকা বিক্রি করতে আরম্ভ করল।

রোজগার মন্দ হয় না। সে রেলগাড়ির একখানি কামরায় একটি ছোট ছাপাখানা বসিয়ে নিজেই একখানা সংবাদপত্র বের করল। নিজেই সংবাদ রচনা করে, ছাপে আর বিক্রি করে।

ছেলেটি বাড়ী থেকে তার ছোট্ট পরীক্ষাগারটি তুলে আনল ট্রেনের সেই কামরায়। এইভাবে সংবাদপত্র বিক্রি করা আর রাসায়নিক দ্রব্য নিয়ে পরীক্ষা করা—দু'কাজই একসঙ্গে চলতে লাগল।

একদিন পরীক্ষা করার সময় শিশি থেকে একটি রাসায়নিক দ্রব্য গড়িয়ে পড়ল মেজেতে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীতে আগুন ধরে গেল। ট্রেনের ড্রাইভার ছুটে এসে ছেলেটির জিনিসপত্র টান মেরে বাইরে ফেলে দিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিল।

এই ছেলেটির নাম টমাস আলভা এডিসন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। ট্রেনের ড্রাইভারের কাছে নির্যাতিত হ'লেও পরবর্তী কালে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হয়েছিলেন।

ঐ দুর্ঘটনার পর এডিসন টেলিগ্রাফির কাজ শিখে টেলিগ্রাফ-আপিসে অল্প বেতনের একটি চাকরি পেলেন। এখানে সহকারী হ'ল তাঁরই মত বয়সের আর একটি ছেলে। দু'জনে মিলে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু বিপদ হ'ল এই যে, অপর টেলিগ্রাফ-আপিস থেকে এত তাড়াতাড়ি সংবাদের সংকেত আসতে লাগল যে, তা থেকে সংবাদ গ্রহণ করা এই অনভিজ্ঞ ছেলে দু'টির পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠল।

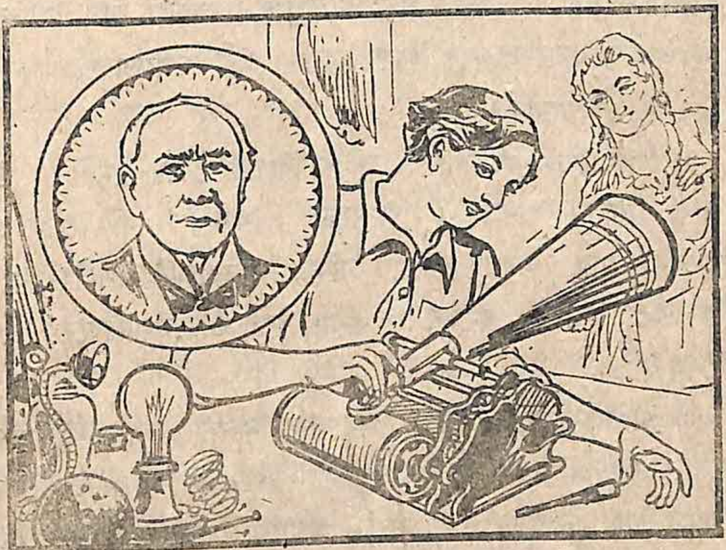
বিপদে পড়ে এডিসন এক ফালি লম্বা কাগজ তাঁর নবনির্মিত একটা যন্ত্রে পরালেন; এবার অন্য আপিস থেকে যে সব সংবাদ আসতে লাগল, সেগুলির সংকেতের ভিন্ন ভিন্ন দাগগুলি কাগজ-খানার ওপর পড়তে লাগল। এরপর কাগজখানা তিনি তাঁর নব-আবিষ্কৃত আর একটি যন্ত্রের ভেতর দিয়ে আস্তে আস্তে টানতে থাকলেন। এইবার সংবাদের সংকেতগুলির (টরে-টক্কা) শব্দ ধীরে ধীরে বের হ'তে লাগল। ধীরে ধীরে সংকেতের শব্দ বের হওয়ায় সংবাদ-গ্রহণে তাঁদের আর কোন অসুবিধে হ'ল না।

কিন্তু এই ব্যবস্থা বেশিদিন চলল না। একসময়ে চারদিক থেকে এত বেশি টেলিগ্রাম আসতে আরম্ভ করল যে, বালক দু'টি তাদের উদ্ভাবিত উপায়ে সংবাদ-গ্রহণে তাল রাখতে পারল না। আপিসের কর্তৃপক্ষ খোঁজ নিতে গিয়ে যখন তাঁদের সংবাদ-গ্রহণের এই অভিনব উপায়ের কথা জানতে পারলেন, তখন তাঁরা সেই কল দু'টির ব্যবহার বন্ধ ক'রে দিলেন। এডিসনের চাকরিও গেল।

এরপর চাকরির সন্ধানে এডিসন গেলেন নিউইয়র্ক শহরে। সেখানকার টেলিগ্রাফ আপিসে হঠাৎ একটি বড় কল গেল বিগড়ে। অনেক কারিগর চেষ্টা করল। কেউ পারল না। এডিসন সেখানে গিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে কলটি ঠিক ক'রে দিলেন। এর ফলে এডিসন সেই আপিসে একটি চাকরি পেয়ে গেলেন বেশ মোটা বেতনে। পূর্বের টেলিগ্রাফ-আপিসে চাকরি করার সময় তিনি যে যন্ত্র দু'টি দিয়ে সংবাদের সংকেত ধরতেন, সেইগুলি নিয়ে তিনি এবার ভাবতে লাগলেন—মানুষের কণ্ঠস্বর থেকে দাগ কাটা আর সেই দাগ থেকে কণ্ঠস্বর বের করা যায় কিনা। তিনি এসম্বন্ধে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন এবং অল্প দিনের মধ্যে কৃতকার্য হয়ে ফনোগ্রাফযন্ত্রের আবিষ্কার করেন। তাঁর এই আবিষ্কারের প্রাথমিক পরীক্ষাটি ছিল সামান্য।

এডিসন একখানি টান চামড়ার গায়ে পিন্ লাগিয়ে নিলেন। পিনের মাথা গিয়ে আলগোছে ঠেকে রইল একখানি মোম-মাখানো কাগজের গায়ে। এইবার তিনি চামড়ার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ দিয়ে হুঃ ক'রে শব্দ করলেন এবং মোম-লাগানো

কাগজখানা সঙ্গে সঙ্গে একটু টানলেন। দেখলেন, কাগজখানায় একটি দাগ পড়েছে। এরপর যখন তিনি পিন্‌টি সেই দাগের গোড়ায় বসিয়ে কাগজখানা টানলেন, তখন সেই শব্দটি হুবহু শোনা গেল। মানুষের গলার স্বর ধরে রাখা সম্ভব হ'ল।



এডিসনের আবিষ্কৃত কলের গানে মানুষের গলার স্বর ধরে রাখা সম্ভব হ'ল।

এডিসন এরপর তাঁর যন্ত্রের উন্নতি করতে থাকলেন। অবশেষে ফনোগ্রাফের সৃষ্টি হ'ল। এই আবিষ্কারের ফলে কলের গানে মানুষের গলার স্বর ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। এরপর এডিসন আবিষ্কার করেন, বায়োস্কোপের যন্ত্র। তিনি দীর্ঘজীবন ধরে বহু যন্ত্রেরই আবিষ্কার করে গিয়েছেন। সেগুলির মধ্যে ফনোগ্রাফ আর বায়োস্কোপ-যন্ত্র দুইটি শ্রেষ্ঠ।

মেরী কুরী

বিজ্ঞানজগতে নব নব আবিষ্কারের জন্য যাঁরা চিরস্মরণীয় হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ বিজ্ঞানীই নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করে গিয়েছেন। মেরী স্কল্‌ডোয়াস্কা কুরীও ছিলেন এই দলের।

পোলাণ্ডের এক সামান্য স্কুলমাষ্টারের মেয়ে মেরী। তাঁর বাবা ছিলেন গণিত ও বিজ্ঞানের শিক্ষক। মেরী লেখাপড়া করেন আর অবসর-সময়ে বাবার বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারের কাজকর্মে সাহায্য করেন। এমনি করে তাঁর স্কুলজীবনের শিক্ষা শেষ হয়।

এরপর মেরী বেরিয়ে পড়লেন নিজের ভাগ্য-অন্বেষণে। তিনি এলেন প্যারিসে। প্যারিসে এসে অনেক কষ্টের ভেতর দিয়ে তাঁর দিন কাটতে লাগল। এখানে নিজের চেষ্টায় মেরী এক রসায়নাগারে জিনিসপত্র ধোয়ামোছার একটি কাজ পেলেন। এর কিছুদিন পরে মেরী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং সেখানে অধ্যাপক পিয়ের কুরীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

অধ্যাপক পিয়ের কুরী ছিলেন বৈজ্ঞানিক। মেরী অধ্যাপক কুরীর সঙ্গে বিজ্ঞান-সম্বন্ধে নানা আলোচনা করতেন। কিছুদিন পরে তাঁদের বিয়ে হয়। বিয়ের পর স্বামিস্ত্রীতে মিলে তাঁরা বিজ্ঞানের গবেষণা আরম্ভ করলেন।

এই সময়ে বিজ্ঞানী রন্‌টগেন এক্‌স-রশ্মি আবিষ্কার করেন। এক্‌স-রশ্মি আবিষ্কৃত হওয়ার পর অন্য কোন উপায়ে এই রশ্মি বের করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য বিজ্ঞানীরা বহু স্থানে গবেষণা করছিলেন।

বেকারেল নামে একজন বিজ্ঞানী লক্ষ্য করলেন যে, ইউরেনিয়ম থেকে এক্‌স-রশ্মির মতই একরকমের তেজ বের হয়। ইউরেনিয়ম ছাড়া অন্য কোন পদার্থ থেকে এই তেজ বের হয় কিনা তা জানার জন্য ম্যাডাম কুরীও গবেষণা আরম্ভ করলেন।

বেকারেল ইউরেনিয়ম পেয়েছিলেন পিচব্লেণ্ড নামে এক খনিজ পদার্থ থেকে।

পিচব্লেণ্ড থেকে ইউরেনিয়ম বের করে নেওয়ার পর যে অংশ অকেজো বলে ফেলে দেওয়া হ'ত, কুরী সেই অকেজো অংশ নিয়ে পরীক্ষা করে জানতে পারলেন, তার তেজ ইউরেনিয়মের তেজের চেয়ে অনেক বেশি। এই সময়ে অধ্যাপক কুরীও তাঁর স্ত্রীর গবেষণায় যোগ দিলেন। তাঁরা ভাবলেন, পিচব্লেণ্ডের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কোন অনাবিষ্কৃত পদার্থ আছে, যার তেজ ইউরেনিয়মের থেকে বেশি।

এই অজানা তেজস্কর পদার্থটি বের করার জন্য কুরী-দম্পতি অক্লান্ত পরিশ্রম করে যেতে লাগলেন। তাঁদের অর্থ নেই, এমন কি অতি-প্রয়োজনীয় পিচব্লেণ্ডও নেই। এমন সময় তাঁরা একটন পিচব্লেণ্ড পেয়ে গেলেন। গুদাম ঘরের মত একটা ছোট ঘরে তাঁরা গবেষণা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

প্রায় চার বছর গবেষণার পর তাঁরা পিচব্লেণ্ড থেকে একটি নূতন পদার্থ বের করলেন। এই পদার্থের তেজ ইউরেনিয়মের চেয়ে বেশি। ম্যাডাম কুরী এই নব-আবিষ্কৃত পদার্থের নাম দিলেন পলোনিয়ম।

পলোনিয়ম আবিষ্কৃত হ'ল বটে, কিন্তু এখন পর্যন্ত তাঁদের কল্পিত সেই অতি তেজস্কর পদার্থটি আবিষ্কৃত হয়নি। আবার গবেষণা চলতে থাকল। অবশেষে তাঁরা সত্যি সত্যিই তাঁদের



অবশেষে কুরী দম্পতি সত্যি……রেডিয়াম।

সেই কল্পিত পদার্থটি আবিষ্কার করলেন। এই পদার্থটির নাম দিলেন রেডিয়ম। কুরী-দম্পতি একটন পিচব্লেণ্ড থেকে অতি সামান্য রেডিয়ম বের করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাও আবার অবিশুদ্ধ অবস্থায়।

কুরী-দম্পতির আবিষ্কারের কথা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁদের নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হ'ল।

ফরাসী সরকারও তাঁদের দু'জনকে দুটি নূতন পদে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময় অধ্যাপক কুরী এক দুর্ঘটনায় মারা যান।

স্বামীর মৃত্যুর পর ম্যাডাম কুরী তাঁর স্বামীর স্থলে অধ্যাপিকা নিযুক্ত হলেন। স্বামীকে হারিয়ে আবার তিনি একাগ্রচিত্তে একাকী গবেষণা আরম্ভ করলেন। এই গবেষণার শেষে তিনি বিশুদ্ধ অবস্থায় পলোনিয়ম রেডিয়ম আবিষ্কার করেন ১৯১১ খৃষ্টাব্দে। এই আবিষ্কারের জন্য আবার তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। দু'বার নোবেল প্রাইজ পাওয়া আজ পর্যন্ত কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। শুনলে অবাক হবে যে, ম্যাডাম কুরীর মেয়ে আর জামাইও নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন।

রেডিয়ম আবিষ্কৃত হওয়ার পর ঐ পদার্থটির সম্বন্ধে নানা রকম গবেষণা চলতে থাকে। গবেষণার ফলে বহু নূতন নূতন আবিষ্কার সম্ভবপর হয়েছে।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে এই বিখ্যাত মহিলা বিজ্ঞানী পরলোক-গমন করেন।

———

আলবার্ট আইনষ্টাইন

আলবার্ট আইনষ্টাইন বর্তমান যুগের এক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। এঁর বিরাট প্রতিভা ও অদ্ভুত চিন্তাশক্তি মানুষকে বিস্মিত করেছে। ইনি বিজ্ঞান-জগতে বহু জটিল সমস্যার সমাধান করে অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন।

আইনষ্টাইনের মতে, পদার্থ ও শক্তি একে অন্যের রূপান্তরিত অবস্থা। কোন নির্দিষ্ট ওজনের পদার্থ থেকে কি পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাবে, আইনষ্টাইনের এই সিদ্ধান্তকে অবলম্বন করে অ্যাটম বোমার আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে।

আইনষ্টাইন নিউটনের মহাকর্ষতত্ত্বের এক নূতন ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, আলোক-রশ্মিও মহাকর্ষের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। তাঁর মতে, পৃথিবীর পাশ দিয়ে যে আলোকরশ্মি যায়, পৃথিবী তাকে আকর্ষণ করে। নক্ষত্রের আলো যখন সূর্যের পাশ দিয়ে এসে পৃথিবীতে পড়ে, তখন সূর্যের আকর্ষণে তা খানিকটা বেঁকে আসে। এই আলো কতটা বাঁকে, তিনি অঙ্ক কষে তাও বলে দিলেন। সূর্যগ্রহণের সময় নক্ষত্রের আলো পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, আইনষ্টাইন যতটা বলেছিলেন, ঠিক ততটাই বাঁকে।

বিজ্ঞান-জগতে আপেক্ষিকতাবাদ আইনষ্টাইনের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। এই তত্ত্বটি অতি জটিল। তোমরা বড় হয়ে জানবে।

আইনস্টাইন বলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একই নিয়মের দ্বারা পরিচালিত। গ্রহ, নক্ষত্র, আলোক, বিদ্যুৎ, অ্যাটম সব কিছুর মধ্যে একই নিয়ম কাজ করছে। অল্প কয়েকটি নিয়মের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত রহস্যকে একদিন ধরে ফেলেছেন



আইনষ্টাইন অঙ্ক কষে······একই নিয়মের দ্বারা পরিচালিত।

আইনস্টাইন। মানুষের চিন্তাশক্তির চরম প্রকাশ হয়েছে আইনস্টাইনের এই সিদ্ধান্তে। মানুষ এতদিন জেনে আসছিল যে, আকাশ সমাকার। আইনস্টাইন বললেন, আকাশ সমাকার নয়—বক্রাকার। এই সিদ্ধান্তের ফলে পূর্বেকার অনেক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হয়েছে।

উইলিয়াম হার্ভে

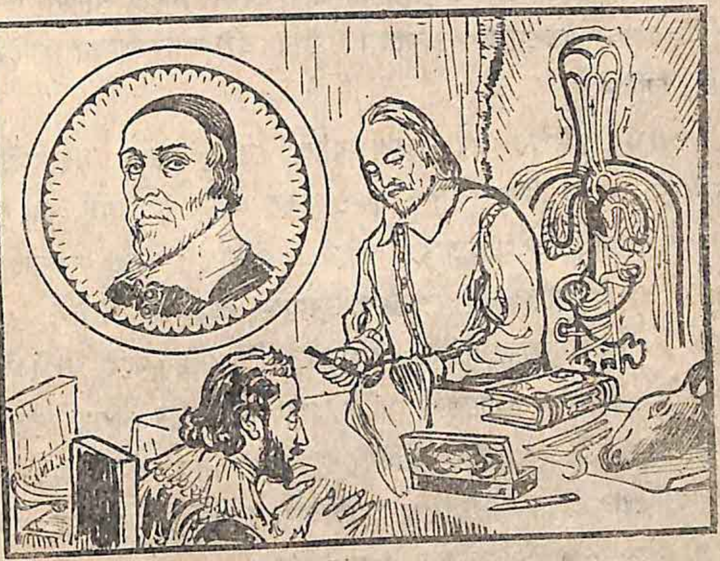
উইলিয়ম হার্ভে ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করে লণ্ডন শহরে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তবে সাধারণ ডাক্তারদের মত তিনি শুধু চিকিৎসাই করতেন না, চিকিৎসাশাস্ত্র-সম্বন্ধে গবেষণাও করতেন।

হার্ভের সমসাময়িক চিকিৎসকদের জানা ছিল যে, মানুষের হৃৎপিণ্ডে চারটি প্রকোষ্ঠ আছে এবং শিরা ও ধমনীর পথ দিয়ে রক্ত-চলাচল করে। কিন্তু হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে রক্তসঞ্চালনের পথগুলির যোগাযোগ কি, তা তখন জানা ছিল না। হার্ভে এ-সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করলেন; অনেক গবেষণার পর তিনি বললেন, হৃৎপিণ্ডের বাঁ দিকের প্রকোষ্ঠ থেকে যে রক্ত বের হয়ে যায়, সেই রক্তই আবার অন্য পথে হৃৎপিণ্ডের ডানদিকের প্রকোষ্ঠে ফিরে আসে। দেহের মধ্যে রক্ত-সঞ্চালনের এই প্রক্রিয়া সর্বদা চলছে, হৃৎপিণ্ড দপ্ দপ্ করে রক্ত সঞ্চালিত করে দিচ্ছে। কিন্তু কিভাবে এই যোগাযোগ ঘটছে, তা তিনি দেখাতে পারেন নি।

হার্ভের সিদ্ধান্তের কথা যখন প্রচারিত হ'ল, তখন কি চিকিৎসক, কি জনসাধারণ কেউ তা বিশ্বাস করল না। হার্ভে তাঁর পরীক্ষা একটি সভায় সকলকে দেখাবেন বলে ঘোষণা করলেন। নির্দিষ্ট সময়ে তিনি তাঁর যন্ত্রপাতি নিয়ে সভায় উপস্থিত

হয়ে দেখেন যে, তাঁর পরীক্ষা দেখবার জন্য সভায় একটিমাত্র লোক হাজির হয়েছে।

পরবর্তী কালে হার্ভের সিদ্ধান্ত অবশ্য সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে একজন অধ্যাপক দেখালেন



নির্দিষ্ট সময়ে হার্ভে তাঁর······হাজির হয়েছে।

যে, দেহের ভেতরে একরকমের অতি সূক্ষ্ম রক্তজালক আছে। রক্ত এই সব রক্তজালকের ভেতর দিয়ে ধমনী থেকে শিরায় যাচ্ছে।

এইভাবে রক্তজালকগুলোর ভেতর দিয়েই রক্তচলাচলের যোগাযোগ ঘটে। হার্ভে যা অনুমান করেছিলেন পরে তা সত্য বলে প্রমাণিত হ'ল।

এডওয়ার্ড জেনার

বসন্ত রোগের জন্য আমরা যে টীকা নিয়ে থাকি, তার আবিষ্কারক এডওয়ার্ড জেনার। তাঁর এই আবিষ্কারের কাহিনী অতি বিচিত্র।

পূর্বে পৃথিবীর সব দেশে বসন্ত রোগ দারুণ মহামারীর আকারে দেখা দিত আর লোকও মরত অনেক। এই রোগের বিশেষ কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা তখন্ ছিল না। তবে ভারতবর্ষ, তুরস্ক প্রভৃতি কয়েকটি দেশে একটি ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তা হচ্ছে এই, বসন্তরোগাক্রান্ত কোন রোগীর দেহ থেকে খানিকটা পুঁজ নিয়ে সুস্থ লোকের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হ'ত। তার ফলে ঐ লোকটির ভবিষ্যতে আর বসন্ত রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকত না বটে কিন্তু পুঁজ প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ লোকটির বসন্ত দেখা দিত এবং সময় সময় তা মৃত্যুর কারণ হ'ত।

একজন ইংরেজ মহিলা পূর্বদেশ থেকে এই চিকিৎসা-পদ্ধতির কথা জেনে গিয়ে তা ইংলণ্ডে চালু করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে লোকের তেমন আগ্রহ ছিল না, কেননা এ রকম চিকিৎসা-পদ্ধতিতে মারাত্মক বসন্ত রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকত।

এডওয়ার্ড জেনার ছিলেন একজন ডাক্তার। তিনি চিন্তা করছিলেন, বসন্ত-রোগীর পুঁজ ছাড়া অন্য কি উপায়ে এই

রোগের চিকিৎসা হতে পারে। এই সময়ে তাঁর এক গোয়ালিনীর কথা মনে পড়ে গেল। গোয়ালিনী জেনারকে বলেছিল যে, তার কখন বসন্ত রোগ হওয়ার আশঙ্কা নেই, কারণ, তার নাকি একবার গোবসন্ত হয়েছিল। বসন্তের মহামারীর সময়



জেনার নিজের ছেলের ওপরেও এই টীকার পরীক্ষা করলেন।

কত লোক মারা পড়ে কিন্তু গোয়ালিনীরা বেশ সুস্থ থাকে। তাদের বসন্ত হলেও দুটি একটি গুটি বের হয় মাত্র। জেনার ভাবতে লাগলেন, তা হলে কি গোবসন্তের টীকা দিয়ে বসন্ত রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

এরপর জেনার গোবসন্তের গুটি থেকে পুঁজ সংগ্রহ করলেন এবং তা দিয়ে একটি ছেলেকে টীকা দিলেন। ছেলেটির বসন্ত

রোগ দেখা দিল না। পরে সেই গ্রামে বসন্ত রোগে যখন অনেকে মারা গেল, তখন ছেলেটির কিছু হ'ল না। জেনার নিজের ছেলের ওপরেও এই টীকার পরীক্ষা করলেন।

জেনার তাঁর এই চিকিৎসা-পদ্ধতির কথা প্রচারিত করলেন। কিন্তু কেউ তাঁর কথা বিশ্বাস করল না! বরং তাঁকে ব্যঙ্গ করতে লাগল গোরুর ডাক্তার বলে।

জেনার কিন্তু নিরুৎসাহ হলেন না। এই পদ্ধতিতে তিনি তাঁর চিকিৎসা চালিয়ে যেতে লাগলেন। আশেপাশের অনেক গরীব লোক তাঁর কাছে টীকা নিল। যারা তাঁর কাছে একবার টীকা নিল, তাদের আর বসন্ত হ'ল না।

ধীরে ধীরে জনসাধারণের বিশ্বাস হতে লাগল। অনেক সম্ভ্রান্ত লোক নিজেদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে টীকা দেওয়ার জন্য জেনারের কাছে আসতে লাগল। সম্রাট নেপোলিয়নও এই টীকা নিলেন। জেনারের আবিষ্কারের কথা পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। এর ফলে কয়েক বছরের মধ্যে এই রোগে মৃত্যুর হার অনেক কমে গেল।

বর্তমানে আমরা যে বসন্তের টীকা নিয়ে থাকি এডওয়ার্ড জেনারই তার আবিষ্কর্তা।

———

লুই পাস্তুর

পাগলা কুকুর-শেয়ালে কামড়ালে আগে লোকের জলাতঙ্ক রোগ হ'ত আর এই রোগে মৃত্যু ছিল অনিবার্য। লুই পাস্তুর জলাতঙ্ক-রোগ-নিবারণের জন্য এক ঔষধ আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের ফলে দুরারোগ্য জলাতঙ্ক-রোগের আক্রমণ থেকে মানুষ চিরদিনের জন্য রক্ষা পেয়েছে। পাস্তুর সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

লুই পাস্তুরের জন্ম হয় ১৮২২ খৃষ্টাব্দে। ছেলেকে অধ্যাপক করার জন্য লুই পাস্তুরের পিতা তাঁকে লেখাপড়া করতে পাঠিয়ে দিলেন ফরাসি দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে। রসায়ন-শাস্ত্র ছিল তাঁর প্রিয়। এ সম্পর্কে তিনি সর্বদা পড়াশুনা ও গবেষণা করতে ভালবাসতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে পাস্তুর বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমে প্রমাণ করেন যে, বাতাসে, ধূলা-বালিতে অসংখ্য জীবাণু রয়েছে। এইজন্য বাতাসের সংস্পর্শে এসে চিনি গেঁজে ওঠে অথবা দুধ কেটে যায়। পাস্তুর সিদ্ধান্ত করলেন যে, জীবাণুদের জন্যই জীবদেহে নানা রকমের রোগের উৎপত্তি হয়। পাস্তুরের এই আবিষ্কারের ফলে অনেক ব্যাধির কারণ জানা গেল।

পাস্তুরের সময়ে ইউরোপে অ্যানথ্রাক্স নামে এক ভয়ানক রোগে বহু পশু মারা পড়ত। গোরু বা ভেড়ার পালে যদি

একটি পশুর এই রোগ দেখা দিত, তবে অল্প সময়ের মধ্যে রোগ সংক্রমিত হয়ে দলকে দল গোরু-ভেড়া মারা পড়ত।

বৈজ্ঞানিক কক অনুবীক্ষণ-যন্ত্র দিয়ে অ্যানথ্রাক্স-রোগাক্রান্ত ভেড়ার রক্তে এক রকম জীবাণু লক্ষ্য করেন। পাস্তুর এই জীবাণু নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। তিনি বললেন যে, অ্যানথ্রাক্স রোগের সতেজ জীবাণু থেকে নিস্তেজ জীবাণু সৃষ্টি ক'রে যদি



পাস্তুরের আবিষ্কারের……রক্ষা পেয়েছে। পৃঃ ৪৭

সুস্থ পশুর দেহে তা প্রবেশ করানো যায়, তবে তার রোগলক্ষণ প্রকাশ পাবে না, অথচ তাতে রোগ-প্রতিরোধ-শক্তি এত বেড়ে যাবে যে, সতেজ জীবাণুও তাকে আক্রমণ করতে পারবে না।

পাস্তুর অ্যানথ্রাক্স রোগের নিস্তেজ জীবাণু সুস্থ ভেড়ার দেহে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। কয়েকদিন পরে তিনি আবার

সেই ভেড়ার দেহে সতেজ তীব্র জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দিলেন, দেখলেন, ভেড়ার কোন ক্ষতি হ'ল না। এইভাবে তিনি অ্যানথ্রাক্স রোগের টীকা আবিষ্কার করলেন।

পাস্তর যখন তাঁর আবিষ্কারের কথা প্রচার করলেন, তখন জনসাধারণ বিনা পরীক্ষায় তা বিশ্বাস করতে রাজী হ'ল না। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন পরীক্ষার দিন ঠিক করা হ'ল।

কতকগুলি গোরু-ভেড়া-ছাগল পরীক্ষার জন্য আনা হ'ল। পাস্তর অর্ধেক পশুর দেহে তাঁর আবিষ্কৃত টীকা দিলেন, বাকি অর্ধেকগুলিকে টীকা দেওয়া হ'ল না। এর কয়েকদিন পর সবগুলি পশুর দেহে তীব্র অ্যানথ্রাক্স জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হ'ল। দেখা গেল, টীকা-না-দেওয়া পশুগুলি রোগাক্রান্ত হয়ে মরে গেল, আর টীকা-দেওয়া পশুগুলির কিছুই হ'ল না।

গুটিপোকা থেকে রেশম তৈরি হয়। একবার ফরাসী দেশে গুটিপোকার মধ্যে ভয়ানক মড়ক দেখা দিল। দেশে রেশম-ব্যবসায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হ'ল। এই মড়কের প্রতিকারের ব্যবস্থা করার ভার পড়ল পাস্তরের ওপর। পাস্তর অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন যে, এক প্রকার জীবাণুই গুটিপোকার মড়কের কারণ। তিনি এই মড়কের প্রতিকারের ব্যবস্থা জনসাধারণকে শিখিয়ে দিলেন। গুটিপোকার মড়ক বন্ধ হ'ল।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে লুই পাস্তরের মৃত্যু হয়।

লর্ড লিষ্টার

দেহের ক্ষত বিষাক্ত হয়ে আগে বহু লোক মারা যেত। যে সব রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করা হ'ত, তাদের দেহের অস্ত্রোপচারের জায়গা লাল হয়ে ফুলে উঠত এবং পুঁজ হয়ে যেত। বহু লোক এইভাবে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে মারা যেত। এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন লর্ড লিষ্টার।

লর্ড লিষ্টারের জন্ম হয় ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন হাসপাতালের একজন ডাক্তার।

ক্ষতস্থানের পচন কিভাবে বন্ধ করা যায়, লিষ্টার সে সম্বন্ধে চিন্তা করছিলেন।

পাস্তুর আবিষ্কার করেছিলেন যে, বায়ুস্থিত জীবাণুদের ক্রিয়াতেই দুধ, ছানা প্রভৃতিতে পচন ঘটে।

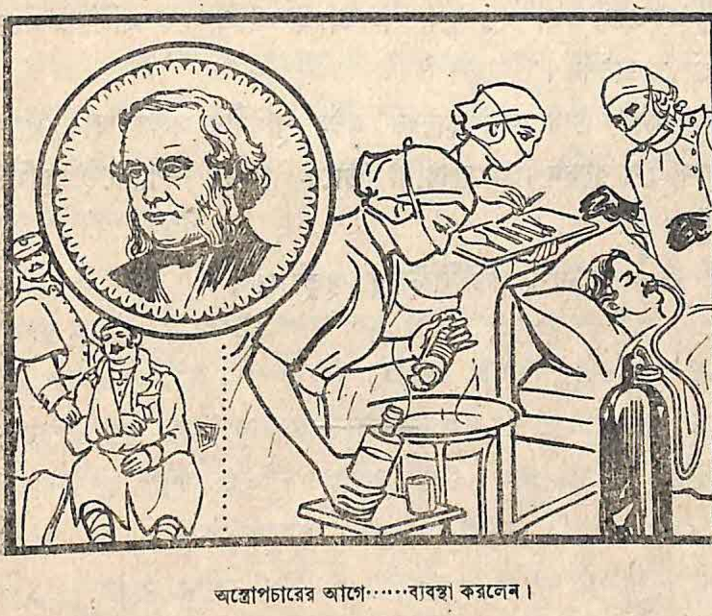
পাস্তুরের সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী লিষ্টার গবেষণা করে জানতে পারলেন যে, বায়ুতে যে সব জীবাণু ভেসে বেড়ায়, তাদের ক্রিয়াতেই ক্ষতস্থান প্রথমে লাল হয়ে ফুলে ওঠে, তারপরে পচন ধরে।

লিষ্টার ক্ষতস্থানের এই জীবাণু নাশ করার জন্য নানারকম পরীক্ষা করতে থাকেন।

অবশেষে জীবাণুনাশক কার্বলিক অ্যাসিড ব্যবহার করে তিনি চমৎকার ফল পেলেন।

অস্ত্রোপচারের আগে তিনি রোগীর ক্ষতস্থানে এবং ডাক্তারী যন্ত্রপাতিতে এই ঔষধ লাগিয়ে জীবাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা করলেন। এর ফলে পূর্বের মত ক্ষতস্থান আর বিষাক্ত হয়ে উঠত না।

লিষ্টারের পদ্ধতি অবলম্বন করে আজকাল বহু জীবাণুনাশক ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু প্রথম যখন লিষ্টার কার্বলিক



অস্ত্রোপচারের আগে······ব্যবস্থা করলেন।

অ্যাসিড ব্যবহারের কথা বলেছিলেন, তখন অনেকে তা বিশ্বাস করে নি। যারা করে নি, তারাই অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, একথা বলা চলে।

রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে একবার যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই বহু সৈন্য আহত হয়েছিল।

আহত সৈন্যদের অস্ত্রোপচারে জাপান লিষ্টারের পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল। ফলে তার লোকক্ষয় বেশি হয় নি।

রাশিয়া লিষ্টারের পদ্ধতি গ্রহণ করে নি। এর জন্য তার লোকক্ষয় হয়েছিল প্রচুর।

এইজন্য বলা হয় যে, লিষ্টারই জাপানকে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জেতালেন।

লিষ্টার তাঁর আবিষ্কারের জন্য পৃথিবীর সকল স্থান থেকে সম্মান পেয়েছেন। দেশবাসী তাঁকে 'লর্ড' উপাধিতে ভূষিত করেছে।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে লর্ড লিষ্টারের মৃত্যু হয়।

রবার্ট কক্

বিজ্ঞানী রবার্ট কক্ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রুশিয়া দেশে জন্মগ্রহণ করেন। চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তিনি পাস্তুরের সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী জীবাণু-সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমে অ্যানথ্রাক্স-রোগাক্রান্ত ভেড়ার দেহে ঐ রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন। এর পর তিনি মানুষের মহাশত্রু যক্ষ্মারোগের জীবাণুর অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। দীর্ঘ এগার বৎসর অনুসন্ধানের পর তাঁর চেষ্টা সার্থক হ'ল। কক্ যক্ষ্মারোগের জীবাণু আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন।

এই সময়ে যক্ষ্মারোগের জীবাণু-সম্বন্ধে ব্যাপক ভাবে গবেষণা আরম্ভ হয়। গবেষণার ফলে জানা গেল যে, শুধু মানুষের দেহে নয়, অন্যান্য প্রাণীর দেহেও এই রোগের জীবাণু সংক্রমিত হয়। মানুষের দেহ থেকে এই মারাত্মক রোগের জীবাণু, গোরু, ভেড়া, বানর, মাছ, পাখী প্রভৃতি প্রাণীর দেহে চলে যায়। অন্যান্য প্রাণীর দেহ থেকে আবার এই রোগ-জীবাণু মানুষকে আক্রমণ করে। সমস্ত প্রাণীর দেহে যে রোগের জীবাণু থাকতে পারে, তার আক্রমণ থেকে কি ভাবে মানুষকে রক্ষা করা যায়, সে সম্বন্ধে গবেষণা চলতে লাগল। গবেষণার ফলে কিছু কিছু প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে। এ-সম্বন্ধে এখনো নানা গবেষণা চলছে।

রবার্ট কক্ কলেরারোগেরও জীবাণু আবিষ্কার করেন। এই রোগের জীবাণু আবিষ্কার করার জন্য তিনি মিশর ও ভারতবর্ষেও এসেছিলেন। নানাস্থানে গবেষণার পর ককের অনুবীক্ষণ-যন্ত্রে কলেরা রোগের জীবাণু ধরা পড়ল। এদের আকৃতি অনেকটা কমার (,) মত।

বিজ্ঞানী কক্ তাঁর গবেষণার ফলে অ্যানথ্রাক্স, যক্ষ্মা ও কলেরা রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন। জীবাণুদের সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ। রক্ত থেকে জীবাণুদের বের করা এবং তাদের বৃদ্ধির ব্যবস্থা করার জন্য তিনি নতুন পদ্ধতিও আবিষ্কার করেন। এই সবের জন্য রবার্ট কক্‌কে জীবাণুবিদ্যার জনক বলা হয়।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে ককের মৃত্যু হয়।

———

ওয়ালটার রীড

ওয়ালটার রীড ছিলেন আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সৈন্যবিভাগের একজন ডাক্তার। জীবাণুদের সম্বন্ধে গবেষণা করা ছিল তাঁর সখ। এজন্য তাঁর নিজের একটি পরীক্ষাগারও ছিল।

যুক্তরাজ্য যখন কিউবা দ্বীপ দখল করে, তখন সে স্থান ছিল পীতজ্বরের জন্য বিখ্যাত। পীতজ্বর নিবারণ করার জন্য যুক্তরাজ্য সরকার এক কমিশন গঠন করেন; ওয়ালটার রীড হলেন এই কমিশনের সভাপতি। গবেষণা আরম্ভ হ'ল। এই সময়ে রোনাল্ড রস্ নামে এক বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন যে, অ্যানোফিলিস নামে এক-জাতীয় মশা ম্যালেরিয়া রোগের কারণ। রোনাল্ডের অনুসন্ধানের কথা শুনে ওয়ালটার রীড ভাবলেন, তবে কি মশাই পীতজ্বরের জীবাণুকে রোগীর দেহ থেকে সুস্থ লোকের দেহে বহন করে নিয়ে যায়? অনুসন্ধান চলতে থাকল। স্টেগোমায়া নামে একজাতীয় মশাকে পীতজ্বরের বাহক বলে অনুমান করা হ'ল।

রীড পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। কমিশনের দু'জন সভ্য তাঁদের ওপর এই পরীক্ষা চালাবার জন্য রীডকে অনুরোধ করলেন। এই পরীক্ষায় মৃত্যু হতে পারে জেনেও তাঁরা ভীত হলেন না। পীতজ্বরে আক্রান্ত রোগীকে কামড়েছে এ রকম কয়েকটি স্টেগোমায়া-জাতীয় মশা সভ্য দু'জনের ঘরে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। মশা দু'জনকেই কামড়াল। কয়েকদিন পরে পীতজ্বরে একজনের

মৃত্যু হ'ল। কিন্তু আরও পরীক্ষা করা চাই। তা না হলে কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যাবে না। লোকের অভাব হ'ল না। প্রাণনাশের আশংকা আছে জেনেও দ্বিতীয়বার পরীক্ষার জন্য এগিয়ে এলেন কিসেনজার নামে একজন সৈন্য আর মোরান নামে একজন সেনাবিভাগের কেরানী।

পীতজ্বর সংক্রামক কিনা এই সঙ্গে তারও পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হ'ল। এজন্যও কয়েকজন সৈন্য এগিয়ে এলেন। দুটি ঘরে দু' রকমের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হ'ল। প্রথম ঘরে রাখা হ'ল পীতজ্বরে মরা এক রোগীর নোংরা কাপড়-চোপড় ও বিছানাপত্র। ঘরটিও বড় অপরিচ্ছন্ন। তবে সে ঘরে যাতে কোন মশা প্রবেশ করতে না পারে, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হ'ল। দ্বিতীয় ঘরটি খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিন্তু সে ঘরে একটি জালের বাক্সে পীতজ্বরের রোগীকে কামড়ানো কতকগুলি মশা রাখা হ'ল। এই দু' ঘরেই লোক শোবে।

রীড অনুমান করেছিলেন যে, প্রথম ঘরে যারা শোবে, তাদের কিছুই হবে না, কারণ, তিনি মনে করতেন যে পীতজ্বর সংক্রামক নয়। দ্বিতীয় ঘরে যাদের মশায় কামড়াবে, তারা পীতজ্বরে আক্রান্ত হবে। প্রথম ঘরে পীতজ্বরে মৃত রোগীর কাপড়-চোপড় পরে রোগীর নোংরা বিছানায় কয়েকজন সৈন্য বিশ রাত ধরে থাকল। দেখা গেল, তাদের কিছুই হ'ল না। দ্বিতীয় ঘরে মোরান শুতে গেল। শোয়ার আগে সে নিজেই মশার বাক্স খুলে দিল। রাতে সেই মশা তাকে কামড়ালো।

রীডের অনুমানই ঠিক হ'ল ; মোরান পীতজ্বরে আক্রান্ত হ'ল। আনন্দের বিষয়, মোরানের জীবননাশ হয় নি। ***

এতদিনে নিশ্চিতভাবে জানা গেল যে, স্টেগোমায়া-জাতীয় মশা-ই পীতজ্বরের জীবাণু বহন করে। তখন পীতজ্বরের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ও আবিষ্কৃত হ'ল।



পীতজ্বর সংক্রামক……পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হ'ল।

পীতজ্বরের কারণ আবিষ্কার করে ওয়ালটার রীড মানুষের অশেষ কল্যাণসাধন করে চিরস্মরণীয় হয়েছেন, আর যাঁরা এই রোগের পরীক্ষার জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, তাঁরাও মানুষের চিরদিনের শ্রদ্ধার পাত্র। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে রীডের মৃত্যু হয়।

রোনাল্ড রস

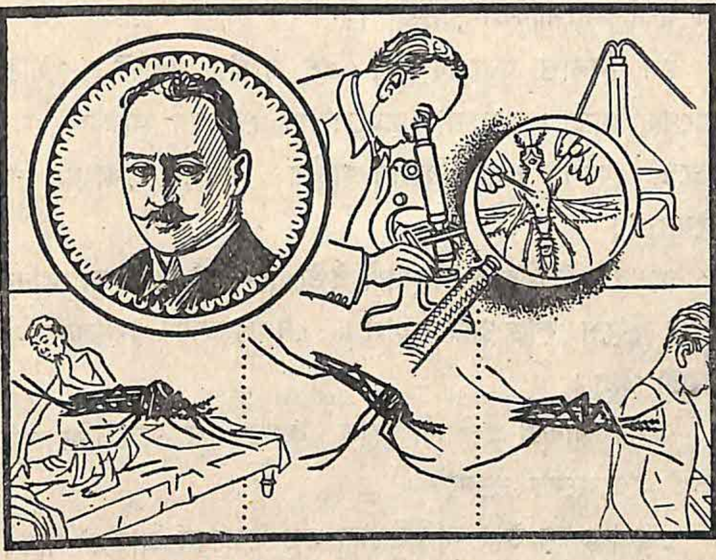
ম্যালেরিয়া এক সাংঘাতিক ব্যাধি। পৃথিবীর বহু জায়গায় ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। ভারতবর্ষে এখনো এই রোগে মৃত্যুর সংখ্যা কম নয়।

পাস্তরের সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী যেমন অন্যান্য রোগের জীবাণু অনুসন্ধান করা হচ্ছিল, তেমনি বিজ্ঞানীরা ম্যালেরিয়া রোগেরও কারণ অনুসন্ধান করছিলেন। লাভেরণ নামে একজন ডাক্তার প্রথমে ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তে এক রকমের জীবাণু লক্ষ্য করেন। তিনি বললেন, মানুষের রক্তে যখন এই জীবাণু জন্মে, তখন ম্যালেরিয়া রোগ হয়।

ম্যানসন নামে আর একজন ইংরেজ ডাক্তার বললেন যে, ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু মানুষের রক্তে বাস করে। মশা যখন মানুষকে কামড়ায়, তখন এই জীবাণু রক্তের সঙ্গে মশার পেটে চলে যায়। সেখানে এই জীবাণুদের বংশবৃদ্ধি হয়। তারপর ঐ মশা যখন কোন সুস্থ লোককে কামড়ায়, তখন তার ম্যালেরিয়া রোগ হয়।

রোনাল্ড রসও ম্যানসনের সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী গবেষণা আরম্ভ করেন। গবেষণা করার আগে তিনি ভারত সরকারের চিকিৎসা-বিভাগে চাকরি করতেন। ভারতবর্ষে ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব দেখে তিনি ম্যালেরিয়ার কারণ অনুসন্ধান

করতে আগ্রহশীল হন, কিন্তু এই কাজ করতে গেলে জীবাণু-সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। সেইজন্য তিনি ফিরে গেলেন ইংলণ্ডে, সেখানে ম্যানসনের সঙ্গে জীবাণু-সম্বন্ধে তাঁর অনেক আলোচনা হ'ল। রস তারপর ভারতে ফিরে এসে গবেষণা আরম্ভ করলেন।



ম্যালেরিয়া রোগীকে···আরম্ভ করলেন।

ম্যালেরিয়া-রোগীকে কামড়েছে এরকম কতকগুলি মশা নিয়ে তিনি পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। তাদের রক্তের মধ্যে এক রকমের জীবাণু দেখতে পাওয়া গেল। এই রকমের মশা কয়েকজনকে কামড়াল কিন্তু দেখা গেল যে তারা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হ'ল না।

রস চিন্তিত হলেন। তবে কি মশা ম্যালেরিয়ার কারণ নয়। তিনি আবার গবেষণা আরম্ভ করলেন। এবার তিনি নূতন একজাতীয় মশা নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। কয়েকদিন আগে ম্যালেরিয়া রোগীকে কামড়েছে এরকম একটি মশার দেহে তিনি অণুবীক্ষণ-যন্ত্র দিয়ে এক নূতন ধরণের জীবাণু দেখতে পেলেন। এই মশা অ্যানোফিলিস-জাতীয়।

রস সিদ্ধান্ত করলেন যে, এই জাতীয় মশা-ই ম্যালেরিয়া রোগের কারণ। সুতরাং ম্যালেরিয়া রোগের আক্রমণ থেকে বাঁচতে হলে অ্যানোফিলিস-জাতীয় মশাকে ধ্বংস করা প্রয়োজন।

রসের এই সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী ইউরোপের বিভিন্ন ম্যালেরিয়া-প্রধান দেশে কাজ আরম্ভ হ'ল। সে সব স্থানে খুব ভালো ফল পাওয়া গেল।

রসের ব্যবস্থা-অনুযায়ী কাজ করার জন্য ম্যালেরিয়াজনিত মৃত্যুর হার অনেক কমেছে!

রোনাল্ড রস তাঁর আবিষ্কারের জন্য 'নোবেল প্রাইজ' পান।

১৯৩২ সালে রসের মৃত্যু হয়।

———

জগদীশচন্দ্র বসু

১৮৯৫ সালে কলকাতা টাউন হলে এক অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দেখাবেন এক বাঙালী বৈজ্ঞানিক।

বাংলার গভর্ণর সহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সেদিন টাউন হলে উপস্থিত হয়েছেন এই পরীক্ষা দেখার জন্য।

যে হলঘরে গভর্ণর সহ অন্যান্য দর্শকরা বসেছেন, তার পাশেই পর পর তিনটি কক্ষ। তিনটিই রুদ্ধ। প্রথম ও দ্বিতীয় কক্ষের পরে তৃতীয় কক্ষে রাখা হয়েছে একটি লোহার বল, একটি পিস্তল আর খানিকটা বারুদ।

পরীক্ষা দেখার জন্য সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। এমন সময় এগিয়ে এলেন সেই বাঙালী বৈজ্ঞানিক। তিনি একটি কল টিপলেন আর অমনি কলের ভিতর বিদ্যুৎতরঙ্গ সৃষ্টি হলো। কলের আর একটি নল দিয়ে এক অদৃশ্য আলোর তরঙ্গ ছুটে গেল গভর্ণর সাহেবের বিশাল দেহ আর দুইটি রুদ্ধ কক্ষ ভেদ করে তৃতীয় কক্ষে। সেখানে অমনি লোহার বলটি আপনা-আপনি হঠাৎ দূরে ছিটকে পড়ল, পিস্তলের আওয়াজ হলো আর বারুদের স্তূপ উড়ে গেল।

সকলে অবাক! বিনা তারে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ কী ক'রে এই অসাধ্য সাধন করল, তা তাঁরা ভেবেই পেলেন না।

সেই বাঙালী বৈজ্ঞানিকের নাম জগদীশচন্দ্র বসু।

যে অদৃশ্য আলোর তরঙ্গ মানুষের দেহ, ঘরবাড়ি, ইট-পাটকেল ভেদ ক'রে অনায়াসেই যেতে পারে এবং অসাধ্য সাধন করতে পারে, তারই পরীক্ষা দেখালেন জগদীশচন্দ্র বসু। এই অদৃশ্য আলোর তরঙ্গের সাহায্যে বিনা তারে সংবাদ পাঠানো যে সম্ভব, তা প্রমাণ করতে সমর্থ হ'লেন তিনি।

জগদীশচন্দ্র বসুর এই আবিষ্কারের দু'বছর পরে রেডিও আবিষ্কর্তা বিখ্যাত মার্কনি সাহেব বেতার-সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা আরম্ভ করেন এবং পরে বেতারযন্ত্র আবিষ্কার করেন। বেতারের মূল সূত্র কিন্তু জগদীশচন্দ্রই প্রথমে আবিষ্কার করেন।

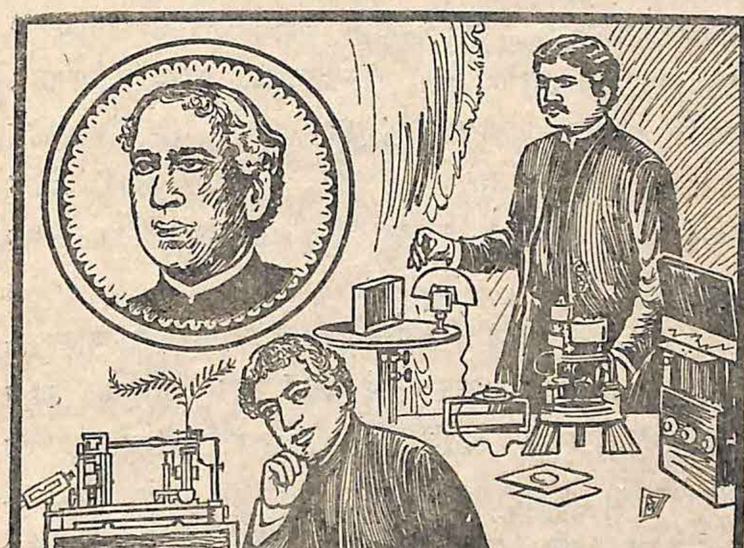
জগদীশচন্দ্র বসু তখন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক। এই পরীক্ষার পরের বছর তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল প্রচারের জন্য এবং ইউরোপের বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য বিলেতে গেলেন। ইউরোপের নানাদেশে ঘুরে তিনি তাঁর গবেষণার ফল দেখিয়ে সকলকে চমৎকৃত করেন। এতদিনে ইউরোপের লোকেরা স্বীকার করল যে, ভারতীয়রাও আধুনিক বিজ্ঞানে প্রতিভার পরিচয় দিতে পারে।

জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরে এসে অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর গবেষণা চালিয়ে যেতে লাগলেন। কয়েক বছরের গবেষণার পর তিনি পুনরায় চাঞ্চল্যকর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করলেন।

এবারে তিনি পরীক্ষা ক'রে দেখালেন যে, বাইরের উত্তেজনায় জড়পদার্থ, উদ্ভিদ ও প্রাণী একইভাবে সাড়া দেয়।

ব্যাপারটা অনেকটা এই রকম। মনে কর, একটা কুকুরকে তুমি বেত দিয়ে আঘাত করলে। কুকুর প্রাণী তার গলার স্বর আছে। তাই সে এই-আঘাতের উত্তেজনায় চেঁচিয়ে সাড়া দেবে। বাইরের উত্তেজনায় কুকুরের মত একটি গাছ ও একখণ্ড টিনও এইভাবে সাড়া দেবে।

গাছ ও টিনের তো গলা নেই যে তারা চেঁচিয়ে সাড়া দেবে। তবে কী করে আমরা বুঝব যে, তারা সাড়া দেয় ?



এবারে তিনি পরীক্ষা ক'রে দেখালেন যে, বাইরের উত্তেজনায় জড়পদার্থ, উদ্ভিদ ও প্রাণী একইভাবে সাড়া দেয়। (পৃষ্ঠা ৬২)

জগদীশচন্দ্র এমন সব যন্ত্র তৈরি করলেন যার দ্বারা প্রাণী, উদ্ভিদ্ ও জড়বস্তুর সাড়া-লিপি আপনা থেকেই লেখা হয়ে যেতে

পারে। জগদীশচন্দ্র তাঁর যন্ত্রে পরীক্ষা করে দেখালেন যে, মাদক জিনিস বা বিষ প্রভৃতি উত্তেজক পদার্থের প্রয়োগে এক টুকরো টিন, একটা গাছের ডাল ও একটা বেঙ একই ভাবে সাড়া দেয়। তিনি আরও প্রমাণ ক'রে দেখালেন যে, প্রাণীর মত গাছপালারও স্নায়ু আছে, সুখ-দুঃখ-বোধ আছে। প্রাণী যেমন আঘাতে ব্যথা পায়, গাছপালাও তেমনি ব্যথা পায়। নিজের তৈরি যন্ত্র দিয়ে তিনি তাঁর আবিষ্কারের প্রমাণ দেখাতে আবার বিলেতে গেলেন। সেখানে তিনি তাঁর যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ ক'রে দেখালেন প্রাণীর মত গাছপালারও অনুভূতি আছে; বাইরের আঘাতে তারাও সাড়া দেয়, কষ্ট পায়। তাঁর যন্ত্রে গাছপালারা তাদের সাড়া দেওয়ার লিপি নিজেরাই লিখে দেখালো। কয়েক-জন সাহেব তাঁর যন্ত্রে বাঁধাকপির কাতরানি দেখে তো অবাক!

আমরা যখন ঘুমাই তখন যদি কেউ আমাদের খুব আলতো-ভাবে স্পর্শ করে, তখন আমরা তা টেরই পাই না, আর যখন জেগে থাকি, তখন সহজেই টের পাই। প্রচণ্ড শীতে বা ঠাণ্ডায় যখন আমরা অত্যন্ত আড়ষ্ট হয়ে থাকি, তখন আমাদের অনুভূতি হ'তে দেরি হয়। গাছপালার বেলাতেও ঠিক এমনিই হয়। অবস্থা বা সময়ভেদে গাছপালারও অনুভূতির এমনি তারতম্য ঘটে। জগদীশচন্দ্র বসু এসব ব্যাপার তাঁর যন্ত্রে প্রমাণ ক'রে দেখিয়েছেন। বেঙের পায়ে চিমটি কাটলে তার অনুভূতি বুঝতে বেঙের সময় লাগে ১৫০ সেকেণ্ড আর লজ্জাবতীর ডালে

চিমটি কাটলে তার অনুভূতি হ'তে লজ্জাবতী লতার সময় লাগে $\frac{৬}{১০০}$ সেকেণ্ড।

জগদীশচন্দ্র বসু যখন তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা করছিলেন, তখন এদেশে ভাল গবেষণাগার বা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ছিল না। অনেক যন্ত্র তাঁকে তৈরি করে নিতে হয়েছিল। এখানে এমনি একটি যন্ত্রের কথা বলছি। এই যন্ত্রটির নাম 'ক্রেস্কোগ্রাফ'। এই যন্ত্রের সাহায্যে কোন জিনিসের সামান্য বৃদ্ধিরও পরিমাপ করা যায়। এই যন্ত্র দিয়ে সামান্য বৃদ্ধিকেও এক কোটি গুণ বড় ক'রে বাড়িয়ে দেখানো যেতে পারে। জগদীশচন্দ্র এমনি একটি ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্র তৈরি করেছিলেন।

এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ে গাছ কতটা বেড়ে ওঠে, এই যন্ত্রের সাহায্যে তা তিনি সকলকে দেখাতে পেরেছিলেন।

জগদীশচন্দ্রের সময়ে এদেশে গবেষণার উপযুক্ত ভাল গবেষণাগার ছিল না। এই অভাব দূর করার জন্য জগদীশচন্দ্র তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে কলকাতার বসুবিজ্ঞান-মন্দির স্থাপন করেন। সেই বিজ্ঞান-মন্দিরের ফলকে লেখা আছে :

ভারতের গৌরব ও জগতের কল্যাণ-কামনায়
এই বিজ্ঞান-মন্দির
দেবচরণে নিবেদন করিলাম।

১৫ই অগ্রহায়ণ, সংবৎ ১৯৭৪ —শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

মেঘনাদ সাহা

ঢাকা জেলার একটি গ্রামে সরস্বতী পূজা। ঢাক-ঢোল বেজে উঠেছে। অঞ্জলি দেওয়ার জন্য ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়েছে সকলে।

এমন সময় গ্রামের একটি গরীব সাহা পরিবারের ছেলে এল সেখানে। সেও অঞ্জলি দিতে চায়। কিন্তু পুরুতঠাকুর তাকে অঞ্জলি দিতে দিলেন না,—কারণ সে অব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ছেলেদের সঙ্গে তার অঞ্জলি দেওয়া চলবে না।

ছেলেটি ক্ষুণ্ণ হয়ে বাড়ি ফিরে গেল। সে প্রতিজ্ঞা করল, কখনও আর পুষ্পাঞ্জলি দেবে না। তবে সে সরস্বতীর পূজা করবে—ফুলপাতা দিয়ে নয়—লেখাপড়ার ভেতর দিয়ে। বিদ্যা দিয়েই সে সন্তুষ্ট করবে বিদ্যার দেবীকে।

এই ছেলেটিই মেঘনাদ সাহা। তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা রেখেছিলেন। জীবনে কখনও পুষ্পাঞ্জলি দেননি তিনি। কিন্তু সারা জীবন জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা ক'রে দেবী সরস্বতীর সত্যিকারের পূজা করেছিলেন।

আর একবারের সরস্বতী পূজার কথা বলছি। মেঘনাদ সাহা তখন কলকাতায় বিজ্ঞানের অধ্যাপক। পাড়ার ছেলেরা চাঁদার খাতা নিয়ে গিয়েছে অধ্যাপক সাহার বাড়িতে।

মেঘনাদ সাহা ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলেন,—"সরস্বতী পূজা কী ক'রে করতে হয় জান তো?

ছেলেরা তো অবাক। তারা বললো—“হ্যাঁ, জানি। আমরা প্রতিমা এনেছি, প্যাণ্ডেল বেঁধেছি। পূজোর দিন পুরুতঠাকুর এসে পূজা করবেন।”

“উঁহু, হলো না,—তোমরা জান না”—বললেন অধ্যাপক সাহা। “এসো আমার সঙ্গে, আমি দেখিয়ে দিই কী ক'রে পূজা করতে হয়।”

এই ব'লে ছেলেদের নিয়ে তিনি গেলেন তাঁর পড়ার ঘরে।

ঘরের মধ্যে হাজার হাজার বই—ছোট, বড়, মাঝারি, ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, জার্মান, ফরাসী, নানা ভাষার। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস—নানা বিষয়ে।

বইয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে ছেলেদের বললেন তিনি—“এইভাবে সরস্বতী পূজা করতে হয়।”

আর একবার সরস্বতী পূজার দিন। ১৯৫৬ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী। সেদিন অনেক পূজামণ্ডপে হঠাৎ আনন্দ-উৎসব থেমে গিয়েছিল একটি সংবাদে।

সংবাদটি এই—“আজ দিল্লীতে অকস্মাৎ ডাঃ মেঘনাদ সাহা পরলোকগমন করেছেন।”

শুধু পূজামণ্ডপে নয়—সারা ভারতে, ভারতের বাইরে সারা বিজ্ঞান-জগতে এই শোকের সংবাদ বিষাদের ছায়া ফেলেছিল!

১৯১৯ সাল। বিলেত থেকে খবর এল ষ্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজের আপিসে।—বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন যা যা বলেছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। সূর্যের পাশ দিয়ে তারার আলো বেঁকেছে। তিনি যেমনটি বলেছিলেন, ঠিক তেমনটি ঘটেছে। এই খবর ছাপা হবে কাগজে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে, কেউ জানে না, আইনস্টাইন কে? কি তাঁর থিওরী? কি প্রমাণ হয়েছে?

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজের লোকেরা দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলেন সারা কলকাতা, কেউ যদি ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে পারে। কিন্তু কলকাতায় কেন, সারা পৃথিবীতে তখন ক'টা লোকেই বা বুঝতে পারতো আইনষ্টাইনের থিওরী।

ভাগ্যক্রমে দেখা হলো অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার সঙ্গে। তিনি তখন বুঝিয়ে দিলেন ব্যাপারটা কি। পরের দিন অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার ব্যাখ্যা সহ খবরটা ছাপা হলো ষ্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজে।

ব্যাপারটা এই—

আইনষ্টাইন বলেছিলেন—আলোর ভর বা ওজন আছে। আকাশে ঢিল ছুঁড়লে পৃথিবীর (মাধ্যাকর্ষণের) টানে যেমন সেটা বেঁকে পড়ে, তেমনি আলোও মাধ্যাকর্ষণের টানে বেঁকে যায়। কিন্তু আলো এক সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে ছুটে চলে। তাই পৃথিবীর টানে আলো কতটা বেঁকে যায়, তা ধরা শক্ত।

আইনষ্টাইন বলেছিলেন, সূর্য বড়। তার মাধ্যাকর্ষণও বেশি। সূর্য থেকে অনেক দূরে আছে তারা। তাই তারার আলো যখন সূর্যের গা ঘেঁষে যায়, তখন সেই আলো বেঁকে য়াবে। কিন্তু সূর্যের আলোর প্রচণ্ড তেজে তারার ক্ষীণ আলো দেখা যাবে কি ক'রে? আইনষ্টাইন বলেছিলেন, সূর্যগ্রহণের সময় যখন সূর্যের আলো কমে যাবে, তখন পরীক্ষা করলে এটা বুঝতে পারা যাবে।

১৯১৯ সালে সূর্যগ্রহণের সময় বৈজ্ঞানিকরা দূরবীণ-ক্যামেরা নিয়ে তাই পরীক্ষা ক'রে দেখেছিলেন যে, আইনষ্টাইনের গণনা ঠিক। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা এই ব্যাপারটাই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কাগজের লোকেদের।

আলো নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিজেও করেছিলেন মেঘনাদ সাহা। আইনষ্টাইন বলেছিলেন, আলোর ভর আছে। আর একজন বৈজ্ঞানিক বলেছিলেন, বাতাস যেমন নৌকার পালে চাপ দেয়, আলোও তেমনি চাপ দেয়। সূর্যের আলো যখন আমাদের গায়ে এসে পড়ে, তখন সেই আলো আমাদের চাপ দেয়, ধাক্কা দেয়, কিন্তু সে ধাক্কা এত সামান্য যে, আমরা তা টেরই পাই না।

আলো যে চাপ দেয়, এটা কেউই পরীক্ষা ক'রে দেখাতে পারেন নি। মেঘনাদ সাহা একটা অতি সূক্ষ্মযন্ত্র তৈরি ক'রে দেখিয়েছিলেন যে, কথাটা ঠিক—আলো চাপ দেয়। এই

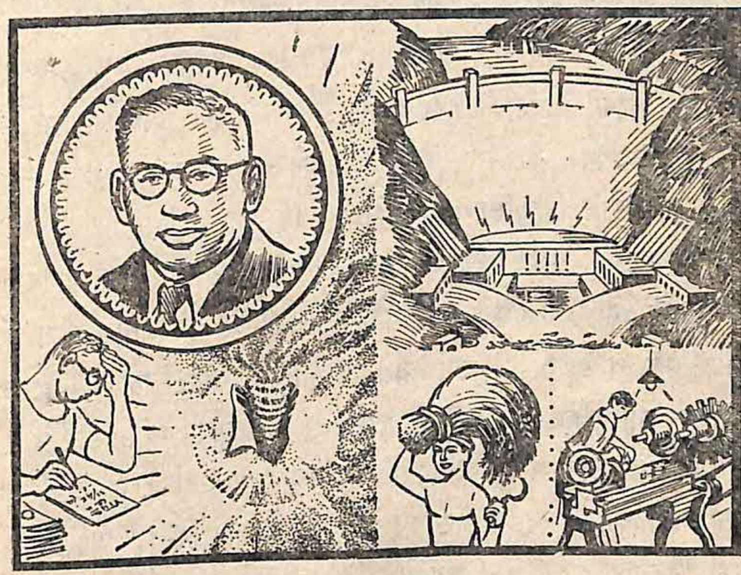
গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টর অব সায়েন্স' উপাধি দেন।

সূর্য ও নক্ষত্র, তাদের আলো ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে মেঘনাদ সাহা অনেক গবেষণা করেছেন। বৈজ্ঞানিকরা জানতেন যে, নক্ষত্র বা তারার মত আমাদের সূর্যও একটা বিরাট জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড। কী ক'রে সূর্যের এত আলো হয়, সূর্যটা কি উপাদান দিয়ে তৈরি, সেটা পরীক্ষা করতে করতে বৈজ্ঞানিকরা দেখলেন যে, সূর্যের আলোর মধ্যে কতকগুলি আলোর রেখা আছে, যার রহস্য কেউ জানে না।

মেঘনাদ সাহার মাথায় ঘুরতে লাগলো ব্যাপারটা। তাইতো, কী ক'রে হচ্ছে এটা সূর্যের মধ্যে! তিনি ভাবতে লাগলেন আর দিনরাত অঙ্ক কষতে লাগলেন। তারপর—একদিন সে রহস্য ধরে ফেললেন। তিনি প্রমাণ করলেন, কী ক'রে সূর্যের প্রচণ্ড তাপে ও চাপে সূর্যের উপাদানগুলি পরিবর্তিত হচ্ছে। আর, তারই ফলে সূর্যের আলোর মধ্যে ঐ রহস্যময় আলোর রেখা দেখা যায়। পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের মধ্যে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। অধ্যাপক সাহার এই সূত্র ধরে এতদিনে সূর্য ও নক্ষত্রদের উপাদান-রহস্যও জানা গেল।

বিজ্ঞানই ছিল ডাঃ মেঘনাদ সাহার জীবনের সাধনা। ভারতে বিজ্ঞানচর্চার নানা অসুবিধা আছে। এখানে ভাল গবেষণাগার নেই, উপযুক্ত যন্ত্রপাতি নেই। ডাঃ সাহা ভারতে বিজ্ঞানচর্চার উন্নতির জন্য অনেক কাজ ক'রে গিয়েছেন। তিনি

বুঝেছিলেন যে, দেশের লোকের সুখ-সুবিধা ও জীবনযাত্রার মান বাড়াতে হ'লে বিজ্ঞান ছাড়া পথ নেই। এজন্য কলকারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি তৈরি করতে হবে। দেশের লোকদের বিজ্ঞান-সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তুলতে হবে। এজন্য তিনি উঠে-পড়ে



লেগেছিলেন। এদেশে কসমিক রশ্মির গবেষণার জন্য, আণবিক গবেষণার জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না।

ডাঃ সাহা একদিন যেমন ভেবে আর অঙ্ক কষে বার করলেন, সূর্যের প্রচণ্ড তাপসৃষ্টির রহস্য, তেমনি চাষের উন্নতি হবে ও জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়ে দেশের শিল্প-সমৃদ্ধি হবে মনে ভেবে, নদীকে নিয়ন্ত্রণ করে বাঁধ দেবার পরিকল্পনা করেছিলেন।

আমাদের দেশের নদীগুলিতে যখন বন্যা হয়, তখন দেশের খুব ক্ষতি হয়। মেঘনাদ সাহা বলেছিলেন, নদী-বিজ্ঞানের গবেষণা হওয়া দরকার। নদীগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করলে বন্যায় ক্ষতি হবে না। চাষের উন্নতি হবে, জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। তাঁরই চেষ্টায় এদেশে নদী-বিজ্ঞানের গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে।

দামোদর নদীকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে তার বন্যার জলকে আজ চাষের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। নদীর জলে বাঁধ দিয়ে জল-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। এই দামোদর-পরিকল্পনার যুক্তি ডাঃ মেঘনাদ সাহাই দিয়েছিলেন সরকারকে।

বিজ্ঞানের দ্বারা দেশের উন্নতি করতে হ'লে একক সাধনার দ্বারা হয় না। এজন্য চাই সমবেত প্রচেষ্টা, বৈজ্ঞানিক সঙ্ঘ ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান। ডাঃ মেঘনাদ সাহার প্রচেষ্টায় আমাদের দেশের নানারকম বৈজ্ঞানিক সঙ্ঘ ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এইসব প্রতিষ্ঠান আজ বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য ও দেশের উন্নতির জন্য নানারকমের কাজকর্ম ও গবেষণা ক'রে চলেছে। এ সবের মূলে মেঘনাদ সাহার দান অনেকখানি।

প্রশ্নাবলী

আর্কিমিডিস

১। আর্কিমিডিস কিভাবে প্রমাণ করেন যে রাজার মুকুটের সোনায় খাদ মেশানো ছিল ?

২। লিভার কি ? কিভাবে লিভার তৈরী হয় ? ইহা কোন কাজে ব্যবহৃত হয়।

৩। কিভাবে আর্কিমিডিসের মৃত্যু হয় ?

গ্যালিলিও

১। কে পেণ্ডুলামের ঘড়ি আবিষ্কার করেন ?

২। গ্যালিলিও আর কি আবিষ্কার করেন ?

৩। গ্যালিলিও জীবনে নির্যাতিত হয়েছিলেন কেন ?

নিউটন

১। নিউটনের কোন্ আবিষ্কার তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা দান করে ?

২। মহাকর্ষ কি ? কিভাবে নিউটনের পক্ষে মহাকর্ষের নিয়মটির আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল ?

ল্যাভয়সিয়ে

১। ফ্লজিষ্টন তত্ত্ব কি ? কিভাবে ল্যাভয়সিয়ে এই তত্ত্বের অসারত্ব প্রমাণ করেন ?

২। "পদার্থের ওজনের নিত্যতা-সম্বন্ধে তাঁর এই সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান-জগতে একটি শ্রেষ্ঠ দান"—এই সিদ্ধান্তটি কি এবং কোন বৈজ্ঞানিকের ?

হামফ্রি ডেভি

১। সেফ্‌টি ল্যাম্প কি ? এই ল্যাম্প কে আবিষ্কার করেন ?

২। "ডেভির সবচেয়ে কল্যাণকর আবিষ্কার হল সেফ্‌টি ল্যাম্প।" এই বাক্যটির সমর্থনে যুক্তি দেখাও।

মাইকেল ফ্যারাডে

১। মাইকেল ফ্যারাডের জীবনে হামফ্রি ডেভির প্রভাব সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

২। বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে আজ পৃথিবী যে সভ্যতার পথে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে—এতে মাইকেল ফ্যারাডের অবদান কতটুকু ?

চার্লস ডারউইন

১। মানুষের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে ডারউইনের মতবাদটি কি ?

পার্কিন

১। মভ কি ? কে এর আবিষ্কারক ? তিনি কিভাবে মভ আবিষ্কার করেন ?

রন্‌টগেন

১। X-Ray কি ? কিভাবে X-Ray আবিষ্কৃত হয় ?

২। চিকিৎসাক্ষেত্রে X-Rayর উপযোগিতা কি ?

টমাস আলভা এডিসন

১। এডিসন প্রথম জীবনে ট্রেনের ড্রাইভারের কাছে নির্যাতিত হয়েছিলেন কেন ?

২। এডিসনের শ্রেষ্ঠ দুইটি আবিষ্কারের নাম কর। কিভাবে তিনি এগুলি আবিষ্কার করেন ?

মেরী কুরী

১। মেরী কুরী কোন্ কোন্ আবিষ্কারের জন্য দু' দু'বার নোবেল প্রাইজ পান ?

২। বিজ্ঞানজগতে কুরী পরিবারের খ্যাতিলাভের কারণ কি ?

আলবার্ট আইনষ্টাইন

১। বিজ্ঞানজগতে আইনষ্টাইনের সর্বশ্রেষ্ঠ দান কি ? সংক্ষেপে এই তত্ত্বটি ব্যাখ্যা কর।

উইলিয়াম হার্ভে

১। চিকিৎসাশাস্ত্রে উইলিয়াম হার্ভের অবদান কি ?

এডওয়ার্ড জেনার

১। বসন্তের টীকার আবিষ্কর্তা কে ? কিভাবে তিনি বসন্ত-রোগ-প্রতিরোধের টীকা আবিষ্কার করেন ?

লুই পাস্তুর

১। আনথ্রাক্স কি ? কিভাবে পাস্তুর আনথ্রাক্স রোগের টীকার আবিষ্কার করেন ?

লর্ড লিষ্টার

১। লর্ড লিষ্টার কি আবিষ্কার করেন ? চিকিৎসাক্ষেত্রে এই আবিষ্কারের কি গুরুত্ব ?

২। রাশিয়া ও জাপানের যুদ্ধে লিষ্টারই জাপানকে জয়ী করেন কি ভাবে ?

রবার্ট কক্

১। রবার্ট কক্ কোন্ কোন্ রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন ?

২। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে রবার্ট ককের অবদান কি ?

ওয়ালটার রীড

১। ম্যালেরিয়া রোগের কারণ কে প্রথম আবিষ্কার করেন ?

২। কোন্ মশা পীতজ্বরের কারণ এবং কিভাবে ওয়ালটার রীড এই কারণ আবিষ্কার করেন ?

রোনাল্ড রস

১। ম্যালেরিয়া রোগ যে জীবাণুঘটিত রোনাল্ড রসের আগে কোন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন।

২। রোনাল্ড রস কি আবিষ্কার করেন ?

৩। রোনাল্ড রস-কে নোবেল প্রাইজ দিয়া সম্মানিত করা হয় কেন ?

জগদীশচন্দ্র বসু

১। বিনা তারে এক অদৃশ্য তরঙ্গের সাহায্যে যে সংবাদ পাঠানো সম্ভব, এটি কার আবিষ্কার ?

২। তিনি কিভাবে এই অসাধ্য সাধন করেন।

৩। রেডিও ও বেতারযন্ত্র কে আবিষ্কার করেন ?

৪। জগদীশচন্দ্রের খ্যাতি কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য ? তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রের নাম কি ?

মেঘনাদ সাহা

১। মেঘনাদ সাহা জীবনে সরস্বতীপূজায় অঞ্জলি দেন নাই কেন ?

২। আইনষ্টাইনের আবিষ্কার মেঘনাদ সাহা কিভাবে ব্যাখ্যা করেন ?

৩। ভারতের বৈষয়িক উন্নতির ক্ষেত্রে মেঘনাদ সাহার অবদান কি কি ?